গালিভরের
সফর নামা
আবুল মনসুর আহমদ

গালিভরের সফর নামা

আবুল মনসুর আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস : ঢাকা

প্রকাশক :
মহিউদ্দীন আহমদ
[illegible]
[illegible]

তৃতীয় সংস্করণ
জুলাই, ১৯৭৮

প্রচ্ছদ :
প্রানেশ কুমার মণ্ডল

মুদ্রণ :
আনোয়ার মুরাদ
দি রিগার্ড প্রেস
১৪২/আর, বংশাল রোড (মকিম বাজার),
ঢাকা-১

মিছরির ছুরিতে ব্রেইন অপারেশনের উস্তাদ
জর্জ বার্ণার্ড শ' স্মরণে

বইয়ে

প্রকাশকের আরয

এই সঙ্কলনের সবগুলি নকশাই তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক কাগযে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রতি নকশায় লেখার মাস ও সনের উল্লেখ আছে এবং তৎকালীন পরিবেশই উহাদের বিষয়বস্তু। উল্লিখিত সময় হইতে দেখা যাইবে যে, তিনটা নকশা ছাড়া বাকী সবগুলিই প্রাক-পাকিস্তান যুগের পুরাতন লেখা। ঐ সময়ে কলিকাতাই আমাদের সাহিত্য ও কালচার-সাধনার কেন্দ্রভূমি ছিল বলিয়া অন্যান্য সকল লেখকের মতই এই লেখকও কলিকাতার কথ্য ভাষাতেই লিখিতেন। পাকিস্তানোত্তর যুগে লেখক তাঁর ভাষায় ও বানানে বিপুল পরিবর্তন আমদানি করিয়াছেন।

কিন্তু লেখকের ভাষার ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিবর্তন সম্বন্ধে পাঠকদের কোনও ভুল ধারণা না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি পুরাতন লেখাগুলির ভাষার কোনও পরিবর্তন করিতে সম্মত হন নাই। যখন যে লেখা যে ভাষায় লিখিয়াছিলেন, এই সঙ্কলনে তাই অপরিবর্তিত রাখা হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণে তিনটি রস রচনা সংযোজিত হইল। এ তিনটিও পুরাতন রচনা। সব কয়টি রচনার সময় উল্লিখিত আছে। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলেও বই-এর আকারে বাহির হইল এই প্রথম। এতে বই-এর রস-ভাণ্ড আরও ভারি হইল বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ঢাকা
১লা অক্টবর, ১৯৭১

আরযগোযার
মহিউদ্দীন আহমদ

গালিভরের সফর-নামা

(অপ্রকাশিত শেষাংশ)

প্রকাশকের আরয

গালিভর সাহেব ছিলেন মশহুর মুসাফির। দুনিয়ার ছোট বড়, ছেলে-বুড়া সবাই তাঁর নাম জানেন, যেমন আমরা সবাই জানি 'ইত্তেফাকে'র মুসাফিরের নাম। তবে তফাৎ এই যে, 'ইত্তেফাকে'র মুসাফিরের খ্যাতি পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ; কারণ পাসপোর্ট-ভিসার হাংগামায় তিনি দেশের বাইরে সফর করিতে পারেন না। তাছাড়া, আজকাল বিদেশে সফর করিতে হইলে হাওয়াই জাহাজে চড়া চাই। হাওয়াই জাহাজের ভাড়া যোগাতে পারে কেবল সরকারী তহবিল। সরকারী খরচে বিদেশে সফর করিতে হইলে মন্ত্রীরার দলের মেম্বর হওয়া আবশ্যক। 'ইত্তেফাকে'র মুসাফিরের এসব সুবিধা নাই। কাজেই, তিনি বিদেশে সফরে যাইতে পারেন নাই। কিন্তু গালিভর সাহেবের আমলে সফরের খুবই সুবিধা ছিল। পাসপোর্ট-ভিসার কোন হাংগামা ছিল না। সের খানেক চিড়া, চার পয়সার বাতাসা অথবা কিছু চীনা বাদাম পুটলায় বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই হইত। গালিভর সাহেব তাই ইচ্ছামত সফর করিতে পারিতেন এবং করিতেন। তাই দুনিয়া-জোড়া তাঁর নাম।

এই গালিভর সাহেবের যে সফর-নামা আপনারা সবাই পড়িয়াছেন, সেখানা লেখা ইংরেজীতে। অজ্ঞ লোকের ধারণা, গালিভর সাহেব শুধু ইংরেজীতেই একখানামাত্র সফর-নামা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা তা নয়। আসলে গালিভর সাহেব দুইখানা সফর-নামা লিখিয়া যান : একখানা ইংরেজীতে, অপরখানা বাংলায়। এইখানে এতকালের

এই গোপন কথা আজ প্রকাশ করিয়া দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করিতেছি যে, গালিভর সাহেব বাংলা জানিতেন; কারণ, তাঁর মাতৃভাষাই ছিল বাংলা—যেহেতু তিনি ছিলেন খাটি বাংগালী। তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় স্পষ্টবাদী। তাঁর স্পষ্ট কথাকে লোকে গালি মনে করিত। তাই, শত্রুরা তাঁর দুর্নাম দিয়াছিল গালি-ভরা। সেই হইতে তিনি গালিভর নামে মশ্‌হুর।

এই বইয়ের প্রথম মুদ্রণের পর আরও কিছু পুরাতন ও উলি-কাটা কাগয-পত্র উদ্ধার করিয়াছি। তাতে দেখা যায় যে, গালিভর সাহেব নোয়াখালী জিলার বাশেন্দা ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল গালিব। নোয়াখালী জিলার গালিবপুর গ্রাম আজও তাঁর স্মৃতি বহন করিতেছে। এতে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে যে, দুশমনেরা গালিব নামকেই বিকৃত করিয়া 'গালিবর বা গালিভর' করিয়াছিল।

যাহোক, গালিভর সাহেবের দু'খানা সফর-নামার মধ্যে ইংরেজীখানা প্রকাশের ভার তিনি দিয়া যান জনাথন সুইফ্‌টের উপর; আর বাংলা-খানা প্রচারের ভার দেন তিনি আমার উপর। গালিভর সাহেব তাঁর ইংরেজী সফর-নামাখানা আঠার শতকেই প্রকাশের হুকুম দিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলাখানার প্রকাশ তিনি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে ওসিয়ত করিয়া যান। তার কারণ এই যে, ইংরেজী সফর-নামা লিখিয়াছিলেন তিনি ফিযিক্যাল জায়েণ্ট (দেও) ও ফিযিক্যাল ডুয়ার্ফ (বাউন)-দেরে লইয়া; আর বাংলা সফর-নামা লিখিয়াছিলেন তিনি ইণ্টেলেকচুয়াল জায়েণ্ট (দেও) ও ইণ্টেলেকচুয়াল ডুয়ার্ফ (বাউন)-দেরে লইয়া। ফিজিক্যাল জায়েণ্ট ও ফিজিক্যাল ডুয়ার্ফদের কাহিনী বুঝিবার মত বুদ্ধি-শুদ্ধি মানুষের আঠার শতকেই হইয়াছিল। কিন্তু ইণ্টেলেকচুয়াল জায়েণ্ট ও ইণ্টেলেকচুয়াল ডুয়ার্ফদের কাহিনী বুঝিবার মত বুদ্ধি-আক্কেল বিশ শতকের আগে মানুষের হইবে না, গালিভর সাহেব ইহা আন্দাযে অনুমান করিয়াছিলেন। বিশ শতকের ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ সালে এবং কোন্ দিন ইহা প্রকাশ করিলে, পাঠকরা তা' বুঝিতে পারিবে, সেটা আন্দায করিবার ভার গালিভর সাহেব আমারই উপর দিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু গালিভর সাহেব একটা ভুল করিয়া গিয়াছিলেন। লোকজনের বুদ্ধি-আক্কেল থাকিল কিনা, সেটা বুঝিতে গেলে বুঝনেওয়ালারও যথেষ্ট বুদ্ধি-আক্কেল থাকা চাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার বুদ্ধি-আক্কেলের যথেষ্ট প্রখরতার অভাবে বড় দেরিতে আজ বুঝিতে পারিয়াছি যে, গালিভর সাহেবের বাংলা সফর-নামা বুঝিবার মত বুদ্ধি-আক্কেল মানুষের অনেক আগেই হইয়া গিয়াছে। তথাপি 'বেটার লেইট দ্যান নেভার' এই নীতির উপর ভরসা করিয়া গালিভর সাহেবের বাংলা সফর-নামা বিলম্বে হইলেও প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ থাকে যে, আমার বাক্স-পেটেরা বা আলমারি না থাকায় আমি গালিভর সাহেবের পাণ্ডুলিপিটি বাঁশের চোংগায় ভরিয়া ঘরের চালে লটকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এত সাবধানতা অবলম্বনের ফলে পাণ্ডুলিপিটি চুরি যায় নাই বটে, কিন্তু উলিতে উহার অনেক পাতা খাইয়া ফেলিয়াছে। উলির মাটি ঝাড়িয়া পুছিয়া যে কয় পাতা উদ্ধার করা গিয়াছে, নিম্নে তাই ছাপা হইল।

(১)
আবার সফর শুরু

না, আল্লাহ্ আমার বরাতে বিশ্রাম লেখেন নাই। তা যদি লিখিতেন তবে এরই মধ্যে আমার আক্কেল হইত। দেখিতেছি, আমার আক্কেল-দাঁত গজায় নাই। আগের দুইটি সফরে কত বালা-মুসিবতে পড়িলাম, নিশ্চিত মরণের হাত হইতে কানের কাছ দিয়া বাঁচিয়া আসিলাম। খোদা-খোদা করিয়া ঘরে ফিরিয়া নিজের দুহাতে দুই কান মলিয়া কসম খাইলাম: আর যদি ঘরের বাহির হই, তবে আমি আমার বাপের ···ইত্যাদি।

কিন্তু কয়েক দিন ঘরে থাকিবার পরই আবার সফরের জন্য মন খেপিয়া উঠিল। ঘরে বসিয়া দম আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইল। কিন্তু মনকে চোখ রাংগাইয়া বলিলাম: হুশিয়ার মন, আবার বিদেশে যাইবার নাম করিবি ত খুন করিয়া ফেলিব।

মন চুপ করিল। কিন্তু তলে তলে সে কি ষড়যন্ত্র করিল খোদাই জানে।

হঠাৎ দেখিলাম, একদিন জাহাজের ডেকে বসিয়া চিড়া বাতাসা চিবাই-তেছি। বুঝিলাম, মন আমাকে বড় জবর ফাঁকি দিয়াছে; আবার সফরে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। মন আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল। আমিও ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

বুঝিলাম, আমিও খুশী হইয়াছি।

কিন্তু বেশীক্ষণ খুশী থাকিতে পারিলাম না। সমুদ্দুরে ঝড় উঠিল। যথারীতি জাহাজ ডুবিল। বরাবরের মতই শুধু আমিই বাঁচিয়া রহিলাম।

কপালে দুঃখ আছে, মরিব কেন?

জাহাজ ডুবিলে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তা আমার জানা ছিল। একটা তক্তার সাথে নিজেরে ভাল করিয়া বাঁধিলাম।

তক্তা ভাসিয়া চলিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য। তক্তাটা অন্যান্য বারের মত ভাটির দিকে না গিয়া এবার উজাইয়া চলিল। এইভাবে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত চলিবার পর তক্তা আসিয়া এক ঘাটে লাগিল।

দেখিলাম, ঘাটে কতকগুলি দেও ডুবাইয়া-সাৎরাইয়া গোসল করিতেছে এবং মাঝে মাঝে সমুদ্দুর হইতে বড় বড় তিমি মাছ ধরিয়া সুরুজের তাপে 'ফ্রাই' করিয়া খাইতেছে। বুঝিলাম, এরা উজ্-বিন-উনুকের বংশধর।

একটা দেও বাম হাতের দুই আংগুলে চিমটা দিয়া তক্তাসহ আমাকে ডান হাতের তলায় তুলিয়া লইল। স্রোতের চোটে আমার পরণের কাপড় খসিয়া পড়িয়াছিল। আমি লজ্জায় উহু-উহু করিতে লাগিলাম।

দেওটা তার সাথীদেরে ডাকিয়া বলিল: ওহে, এটা মানুষই বটে; তবে কোন অসভ্য দেশের বাউন। কারণ, ন্যাংটা থাকার দরুন এই বাউনটা শরমে মরিতেছে।

—বলিয়া দেওটা হাসিল। তার সংগীরাও হো-হো করিয়া উঠিল।

দেওটা বলিল: ওহে অসভ্য বাউন, তোমার শরমের কোন কারণ নাই। আমরা সবাই পুরুষ এবং ন্যাংটা গোসল করিতেছি। ডাংগায়

আমরার সবারই কোট-প্যাণ্টালুন আছে; কোটের পকেটে রুমালও আছে। তোমারে একখানা রুমালে জড়াইয়া লইব। কোন চিন্তা করিও না।

গোসল সারিয়া দেওএরা টানে উঠিল। টার্কিশ তোয়ালে দিয়া শরীর মুছিল। টার্কিশ তোয়ালে মানে আমরার দেশের রাজা-বাদশা-উযির-নাযিররার দরবারী কামরার এক-একখানা গালিচা।

শরীর মুছিয়া তারা কাপড় পরিল। আমারে একখানা রুমালে জড়াইল। রুমাল মানে আমরার দেশের কুড়ি হাত দীঘে-পাশের একখানা ফরাশ। রুমালে জড়াইয়া আমারে একজনের পাশ পকেটে ফেলিল।

(২)

বাউনের দেশে

তারা শহরের দিকে চলিল। কোটের পাশ পকেট হইতে গলা বাড়াইয়া আমি পথ-ঘাট ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলাম।

শহরে ঢুকিতেই দেখিলাম, রাস্তার পাশে খবরের কাগযের স্তূপ। পথচারী লোকেরা এক-একখানা কাগয নিতেছে এবং পাশে-রাখা একটি পাত্রে কাগযের দাম রাখিয়া যাইতেছে। আমার বাহক ও তার সংগীরাও এক-একখানা কাগয নিল এবং ঐভাবে ঐ পাত্রে কাগযের দাম রাখিয়া দিল। কাগয বেচিবার ও দাম লইবার কোন লোক দেখিলাম না।

আমি অবাক হইলাম। বিক্রেতা নাই, তবু জিনিস বিক্রি হইতেছে: ব্যাপার কি? ভাবিতে-ভাবিতেই আমার বাহকরা এক পুস্তকের দোকানে ঢুকিল। এক-একজনে এক-একখানা পুস্তক লইয়া মলাটে লেখা দামটা দরজায় রাখা একটি বাক্সে ফেলিয়া দোকান হইতে বাহির হইল। আমার বিস্ময় বাড়িল। বাহককে আমি বলিলাম: খবরের কাগয ও বই-এর দাম নিবার ত কোন লোক ছিল না, তবে দাম না দিলেই ত পারিতেন।

বাহক ঃ পরের জিনিস নিব, দাম দিব না ? এ কেমন-ধারা কথা বলিতেছ তুমি ?

আমি ঃ আচ্ছা, না হয় দাম দিলেনই ; কিন্তু কিছু কম-টম দিলেও ত পারিতেন। কেউ ত আর জানিতে পারিত না।

বাহক ঃ জানিতে পারিত না কি রকম ? দোকানদার যখন বিক্রিত জিনিস ও বাক্সের পয়সা হিসাব করিয়া গরমিল পাইবে, তখনই ত সে বুঝিবে, কেউ নিশ্চয় কম পয়সা দিয়াছে।

আমি ঃ কিন্তু আপনিই যে কম দিয়াছেন, এটা ত আর সে বুঝিতে পারিবে না।

বাহক ঃ কিন্তু আমার দেশেরই কেউ-না-কেউ কম দিয়াছে, এটা ত সে বুঝিবে ? দেশের একজনের বদনাম হইলেই ত গোটা জাতিরই বদনাম হইল।

কথা বলিতে বলিতে আমার বাহক ও তার সংগীরা ট্রাম লাইনে আসিয়া পড়িল এবং ট্রাম আসিতেই একে-একে সবাই ট্রামে উঠিল।

ট্রামে কোন কণ্ডাক্টর নাই ; চেকার নাই। যাত্রীরা যার-তার ভাড়া দরজায় লটকানো একটা বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসন গ্রহণ করিতেছে। আমার বাহকরাও তাই করিল। আমার ভাড়াও তারা দিল। আমার বাহক আসন গ্রহণ করিতেই আমি গলা বাড়াইয়া বলিলাম ঃ বাক্সের পাশে লটকানো সাইনবোর্ডে যে ভাড়ার 'রেট' লেখা দেখা যায়, সেই অনুসারেই সবাই ভাড়া দেয় ?

বাহক ঃ নিশ্চয় দেয়। কেন দিবে না ?

আমি ঃ এক আনা ভাড়া দিয়া দশ পয়সার রাস্তা কেউ বেড়ায় না ?

বাহক ঃ কেন বেড়াইবে ? কাকে ঠকাইবে ? ট্রাম যে সরকারী সম্পত্তি। সরকারী মানেই ত আমরার সকলের।

আমি আমার বাহককে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলাম যে, প্রত্যেকটি খবরের কাগযে, বইএ এবং ট্রামের প্রতি ভ্রমণে কিছু-কিছু বাঁচাইলে অনেক টাকা সঞ্চয় হইতে পারে।

কিন্তু আমার বাহক ও তার সংগীরা আমার কথা বুঝিল না।

আমি বুঝিলাম, আল্লাহ্ বেচারাদের দেহ যতটা বড় করিয়াছেন, মগয ততটা বড় করেন নাই। আহা মানুষ এত নির্বোধও হয়। বেচারার জন্য আমার মনে বড় কষ্ট হইল। এরা শরীরের দিকে দেও হইলেও মনের দিকে এরা বাউন মাত্র।

আমার বাহক তার বাড়ি পৌঁছিল। সেখানে গিয়া কথাবার্তা ও চাল-চলনে বুঝিলাম, আমার বাহক সে দেশের রাষ্ট্রপতি, যাকে তারা বলে প্রেসিডেন্ট। তাঁর সংগীরা সে দেশের মন্ত্রী।

বিস্ময়ে আমি চোখ বড় করিয়া বলিলাম: আপনারা এ দেশের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী? তবে সরকারী মোটরে চলা ফেরা না করিয়া আপনারা পায়ে হাঁটিয়া এবং নিজের গাঁটের পয়সায় ট্রামে চলা-ফেরা করেন কেন? এ দেশে সরকারী মোটর নাই কি?

প্রেসিডেন্ট: থাকিবে না কেন? অনেক আছে। কিন্তু সেগুলি আমরা শুধু সরকারী কাজেই ব্যবহার করিয়া থাকি, ব্যক্তিগত কাজে ব্যাবহার করি না। সাগরে গোসল করিতে যাওয়াটা এবং প্রাতঃভ্রমণ করাটা সরকারী কাজ নয়।

কিছুদিন থাকিয়াই বুঝিলাম, যেমন প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীরা, তেমনি দেশের লোকজনেরা। সবাই বোকাচণ্ডী। নিজেরা বোকা না হইলে অমন বোকা লোককে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী বানায়?

একদিন শুনিলাম, ভীষন হৈ-চৈ। কি ব্যাপার? দেশে ইলেকশন হইবে। প্রেসিডেন্ট লোকটাকে আমার খুব পসন্দ হইয়াছিল। বোকা হইলেও লোকটা বড় সদয়। আমারে কত যত্ন করেন। কাজেই, নির্বাচনের নামে আমি ঘাবড়াইয়া গেলাম। বলিলাম: আপনি ইলেকশন দিতে গেলেন কেন? যদি হারিয়া যান? আর যদি প্রেসিডেন্ট হইতে না পারেন?

প্রেসিডেন্ট: দেশের লোক যদি না চায়, তবে প্রেসিডেন্ট হইব না। তাই বলিয়া কি নির্বাচন দিব না? নির্বাচনের সময় যে আসিয়া পড়িয়াছে।

আমি: সে সময় ত আপনি পিছাইয়াও দিতে পারেন?

প্রেসিডেন্ট : না, সেটা শাসনতন্ত্রের আইন।

আমি : আইনের কর্তা ত এখন আপনিই। আইন বদলাইয়া ফেলিলেই পারেন।

প্রেসিডেন্ট : আমার প্রেসিডেন্ট বজায় রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্র বদলাইয়া ফেলিব? কি বলিতেছ তুমি?

আমি : হ্যাঁ, বদলাইয়া ফেলিবেন। এমন আইন করিবেন যাতে আপনি বরাবর প্রেসিডেন্ট থাকিতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট : দেশের লোক প্রতিবাদ করিবে যে।

আমি : যারা প্রতিবাদ করিবে, তাদেরে গ্রেফতার করিয়া জেলে পুরিবেন।

প্রেসিডেন্ট : আমি জেলে পাঠাইলে কি হইবে? কোর্টের বিচারে তারা ত খালাস পাইবে।

আমি : কোর্টে যাইতে দিবেন কেন? নিরাপত্তা আইন করিবেন, বিনাবিচারে আটক রাখিবেন।

প্রেসিডেন্ট ও তাঁর মন্ত্রীদের অনেক বুঝাইয়াও আমি বিফল হইলাম। মাথায় মগয না থাকিলে আমি কি করিতে পারি?

এতবড় রাজ্যের প্রেসিডেন্ট, তাঁর বাড়ীতে নাই চাকর-চাকরানী, নাই খানসামা-হুকুমবরদার। বাড়ী-ঘর ঝাড়ু দিবার জন্য, খানা-পিনা খিলাই-বার জন্য সময় মত চাকর-বাকর যারা আসে, তারার না আছে লেহায না আছে তমিয। হুযুর-জাহাঁপনা তারা ত বলেই না। সামান্য 'সার' কথাটাও তারা ব্যবহার করিতে জানে না। এরার মধ্যে মনিব-চাকর বলিয়া কোন আদবের সম্বন্ধ নাই। চাকর মনিবকে নাম ধরিয়া ডাকে। মনিব চাকরকে মিস্টার বলে। অর্থাৎ এমন অসভ্য দেশ এটা যে এখানে মুড়ি-মুড়কির এক দাম। যেখানে উঁচা-নীচা গুরু-শিষ্য জ্ঞান নাই, সে দেশে কোন সভ্য মানুষ বাস করিতে পারে না। আল্লাহ যেমন হাতের পাঁচ আংগুল সমান করিয়া বানান নাই, তেমনি সব মানুষকেও তিনি সমান করিয়া পয়দা করেন নাই। উচ্চ-নীচ আল্লারই ইচ্ছা। এটা যারা

মানে না, তারা ধর্মে বিশ্বাস করে না। অতএব এমন ধর্মহীন, অসভ্য আহমকরার দেশে থাকিয়া কবে কোন্ বিপদে পড়িব, সেই ভয়ে এক-রাত্রে আমি কাউকে কিছু না বলিয়া সে দেশ হইতে পলাইয়া আসিলাম।

(৩)

দেওএর দেশে

দেহ-সর্বস্ব বুদ্ধিহীন অসভ্য আহমকরার দেশে সফর করিয়া মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাই কোন বুদ্ধিমানের দেশে সফর করিয়া মনটা বাহলাইয়া লইবার জন্য খেপিয়া গেলাম।

কোন্ দেশের লোক বেশী বুদ্ধিমান, তার খোঁজ লইবার জন্য অনেক দেশ-বিদেশের খবরের কাগয পড়িলাম। কিন্তু আমার পসন্দ-মত কোন বুদ্ধিমান দেশের খোঁজ পাইলাম না।

তাই আত্মার শান্তি ও মনের সান্ত্বনা লাভের আশায় আপাততঃ হজে যাওয়াই ঠিক করিলাম। চিড়া-বাতাসা গাট্টিতে বাঁধিয়া হজে গেলাম।

দেখিলাম, দেশ-বিদেশের বহু লোক হজ করিতে আসিয়াছে ও আসিতেছে।

এয়ার মধ্যে দেখিলাম, একদল শিশু এক হাওয়াই জাহাজ হইতে নামিতেছে। এতগুলি দুগ্ধপোষ্য শিশু কোথা হইতে কেন আসিল, জানিবার জন্য কাছে গেলাম।

দেখিলাম, আকারে শিশুর মত হইলেও আসলে তারা বয়স্ক লোক। একজন অতিশয় বুড়া। সকলেই তারা খুব দামী পোশাকে সজ্জিত।

তাদার ছোট কদ দেখিয়া আমি যেমন তাজ্জব হইলাম, আমার বড় কদ দেখিয়া তারাও তেমনি অবাক হইল। গোড়াতে একটু ভয় পাইলেও অল্পক্ষণেই তাদার ভয় ভাংগিয়া গেল। খুব খাতির জমিল। আমি তাদার মধ্যেকার সবচেয়ে বুড়া লোকটিকে কোলে তুলিয়া আলাপ করিলাম।

জানিলাম, তিনি এক দেশের রাষ্ট্রপতি। তাঁর কাঁধে সংগীটি ঐ দেশেরই উযিরে-আযম এবং তাঁর সংগীরা তাঁর মন্ত্রী। তাঁরা সরকারী হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া সরকারী খরচে হজ্জ করিতে আসিয়াছেন।

আমি কৌতুহলী হইয়া বলিলাম: সরকারী খরচে নিজেরার ধর্মকার্য করিতে আসিলেন, এতে আপনেরার দেশবাসী আপত্তি' করিবে না?

রাষ্ট্রপতি: সে আপত্তির পথ বন্ধ করিয়াই আসিয়াছি; একটা সরকারী কাজের অজুহাত বানাইয়া লইয়াছি। এদেশের সরকারী লোকের সাথে কিছু সরকারী বাত-চিৎ করিলেই ত আমরার এ সফর সরকারী হইয়া গেল। আমরার দেশের উন্দী লোকেরাও 'রথ দেখা ও কলা বেচা' এক সংগেই করিয়া থাকে।

বুঝিলাম, এইরূপ বুদ্ধিমানের দেশই আমি খুঁজিতেছিলাম। আমি তাঁরার দেশে সফর করিতে আগ্রহ দেখাইলাম। তাঁরা আনন্দের সহিত রাযী হইলেন। হজ সারিয়া তাঁরার হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া তাঁরার দেশে সফরে গেলাম। উযিরে-আযমের মেহমান হইলাম।

উযিরে-আযমের বয়স আশি। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম উযিরে-আযম নির্বাচিত হইয়াছিলেন; আজও উযিরে-আযম আছেন। কেহই তাঁকে হটাইতে পারে নাই। তাঁর মন্ত্রীরারও অনেকে বিশ-পচিশ বৎসর যাবৎ মন্ত্রীত্ব করিতেছেন।

ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর উযিরে-আযমকে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি কি কৌশলে একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর উযিরে-আযম থাকিয়া গেলেন?

উযিরে-আযম: অতি সহজ উপায়ে। ইলেক্‌শন দেই না। যে-ই ইলেক্‌শনের কথা বলে, তাকেই নিরাপত্তা আইনে বন্দী করি।

আমি: আপনার মন্ত্রীরা কিছু বলেন না?

উযিরে-আযম: দুই-এক জন যে না বলে, তা নয়। কিন্তু যখনই কেউ কিছু বলে অমনি তারে ডিসমিস করিয়া নতুন লোকরে মন্ত্রী করি। এতে করিয়া মন্ত্রীরার মাথা একটু ঠাণ্ডা রাখিয়াছি। এখন আর কেউ কিছু বলে না।

আমি : সবাইরে আপনি নিরাপত্তা আইনের ভয় দেখাইয়া বাধ্য রাখিতে পারিতেছেন ?

উযিরে-আযম : না, না, সবাইকে ভয় দেখাইয়া রাজ্য চালান কি সম্ভব ? কিছু লোককে ভয় দেখাই, কিছু লোককে চাকুরি দেই, আর কিছু লোককে পারমিট-কন্ট্রাক্ট দেই। এতেই মোটামুটি প্রায় সব মাতব্বররা বাধ্য থাকে।

আমি : স্বার্থের লোভে এ-দেশের লোক অমন অন্যায় মানিয়া চলে ?

উযিরে-আযম : স্বার্থটা কি দোষের হইল ? স্বার্থের জন্যই ত দুনিয়াদারি। রাষ্ট্র পরিচালনাও ত মানুষের স্বার্থের জন্যই। আমরাও ত দেশেরই মানুষ। আমার দেশের লোকও সবাই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান মাত্রেই নিজের ভাল আগে দেখে। আমার দেশের "পাগলও আপনা মতলব ভাল বুঝে"।

আমি : পরের অনিষ্ট করিয়াও কি এদেশের লোকেরা আপনা মতলব হাসিল করে ?

উযিরে-আযম : কেন করিবে না ? আমার দেশ বুদ্ধিমানের দেশ। তারা 'সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট' নীতিতে বিশ্বাসী। মানুষের জন্য স্ট্রাগল ফর একযিসটেন্স মানেই বুদ্ধির লড়াই। শরীরের লড়াইটা কেবল মাত্র নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর জন্য—যেমন, গরুতে-গরুতে শিং দিয়া গুঁতাগুঁতি হয়। আমার দেশের লোকেরা অস্ত্র-শস্ত্রের লড়াইয়ে বিশ্বাসী নয়। ও-ব্যাপারের তারা ধারও ধারে না। তারা বুদ্ধির যুদ্ধ করিয়াই সকল লড়াই ফতে করিতে চায়।

আমি : জীবনের সব ক্ষেত্রেই কি এই বুদ্ধির লড়াই চলে ?

উযিরে-আযম : কেন চলিবে না ? কোথায় চলিবে না ? রাজনীতিতে আমি আমার দুশমনদেরে কেমন করিয়া দাবাইয়া রাখিয়াছি, সেটা ত তুমি নিজ চোখেই দেখিতেছ। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও এমনি বুদ্ধির লড়াই চালাইতেছি। আত্মীয়-স্বজনকে দিয়া অথবা বেনামীতে নিজেরাই অধিকাংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেছি। অপর লোক—যারারে পারমিট

কন্ট্রাক্ট দিয়া থাকি, তারার সবার নিকট হইতেই মোটা রকম পার্সেন্টেজ লইয়া থাকি। মোট কথা, সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে কোন দিক দিয়াই বিনাস্বার্থে একটি পয়সাও যাইতে দিতেছি না।

আমি ঃ এ সবই ত বলিলেন আপনারার নেতারার কথা। দেশের জনসাধারণও কি এমনি ধরনের বুদ্ধির লড়াই করিতেছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে ?

উযিরে-আযম ঃ তা নয় তবে কি ? আমার দেশবাসীকে তুমি কি মনে করিতেছ ? বুদ্ধি ছাড়া তুমি এদেশে এক পা চলিতে পারিবে না। দোকানে জিনিস কিনিতে যাও, দোকানদার পাঁচ আনার জিনিস পাঁচ টাকা দাম হাঁকিবে। তুমি দু'পয়সা হইতে দামাদামি শুরু করিবে, তবে না তুমি ঠিক দামে জিনিসটি পাইবে। রেশনের দোকানে চাউল কিনিতে যাও, চাউলের মধ্যে পাইবে তুমি মণকরা আধামণ সাদা কাংকর। দুধ কিনিতে যাও, সেরে পাইবে তিন পোওয়া পানি। দুধে পানি দেওয়ার প্রতিযোগিতাটা আমার দেশে আর্ট হিসাবে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, আজকাল বাজারে পানি-মিশানো দুধ বিক্রি হয় না, দুধ-মিশানো পানি বিক্রি হয়।

আমি ঃ খাদ্যদ্রব্য লইয়া এদেশে এমন ঠকামি হয় ?

উযিরে-আযম ঃ ঠকামি বলিতেছ তুমি কাকে ? এটা ঠকামি নয়, বুদ্ধির লড়াই। শুধু খাদ্যদ্রব্য কি বলিতেছ ? ঔষধের মধ্যেও আমার দেশবাসীরা বুদ্ধির কেরামতি দেখাইয়া থাকে। ইন্‌জেকশনের একটা এমপাউল চার টাকা দিয়া কিনিয়া রোগীর গায়ে ইন্‌জেকশন দিয়া তুমি ভাবিলে রোগী এবার বাঁচিয়া উঠিবে। কিন্তু রোগী মরিয়া গেল। কেন ? কারণ, ঐ এমপাউলে ঔষধ ছিল না, ছিল আসলে শুধু পানি। এমপাউল তৈরী হয় লেবরেটরিতে। সেখানে না যায় রোগী, না যায় ডাক্তার। তেমন গোপনীয় জায়গায় সস্তা পানি থাকিতে দামী ঔষধ এমপাউলে ভরিয়া রাখিবে, এমন আহমক আমার দেশে একজনও পাইবে না।

আমি ঃ বলেন কি ? যে ঔষধের উপর মানুষের মরা-বাঁচা নির্ভর করে, তা লইয়াও এরূপ প্রবঞ্চনা ?

উযিরে আযম ঃ প্রবঞ্চনা নয় বুদ্ধির খেল বল। ঔষধের কথা কি বলিতেছ ? ধর্ম কাজেও আমরা আল্লাহ্‌র সাথে পর্যন্ত বুদ্ধির প্রতিযোগিতা করি। ভরপেট খাইয়া মুখ মুছিয়া ঠোঁট শুখনা করিয়া রাস্তায় দেখাই আমরা রোযা রাখিতেছি। আমরা ফরয নামাযের চেয়ে নফল বেশী পড়ি, কারণ আমরা আসল জিনিসের চেয়ে ফাউ বেশী নেই। আর সরকারী টাকায় আমরা কিভাবে হজ করি, তা ত তুমি আগেই দেখিয়াছ। আল্লাহ্ ত পরের কথা, আমরা তাঁরে কেউ দেখি না। এই আমি যে জীবন্ত উযিরে-আযমটা এখানে বসিয়া আছি, ভোটের সময় আমারে পর্যন্ত ভোটাররা বুদ্ধির লড়াইএ হারাইয়া দেয়। আমার দলের নিকট হইতে টাকা নিয়া আমার গাড়ীতে চড়িয়া আরেক দলকে ভোট দিয়া আসে। আমার দলের ভোটের বাক্স যায় খালি।

আমি ঃ ওঃ, তবে বুঝি আপনিও আপনার দেশবাসীর কাছে বুদ্ধির লড়াইএ হারিয়া যান ?

উযিরে-আযম ঃ আরে না, না। আমারে হারাইতে পারে, এমন বাপের বেটা আজও জন্মায় নাই। পানি-মিশানো দুধ ও কাংকর মিশানো চাউল দেয় বলিয়া খরিদ্দাররা দোকানদারের সাথে যা করে আমিও ভোটাররার সাথে তাই করিয়াছি।

আমি কৌতূহলী হইয়া বলিলাম ঃ প্যানি-মিশানো দুধ ও কাংকর মিশানো চাউল দেওয়ার বদলা খরিদ্দাররা কি করে ?

উযিরে-আযম ঃ অন্ধকারে ফাঁক পাইলেই অচল টাকা ও জাল নোট দিয়া দাম পরিশোধ করে।

আমি ঃ ওঃ তাই করে বুঝি ? আপনি ভোটাররার বদমায়েশির জবাব কিভাবে দেন ?

উযিরে-আযম ঃ ভোটের বেলা আমার টাকা নিয়া অপরকে ভোট দিয়াছে বলিয়া আমিও ৯২ নম্বরের এটমবোমা মারিয়া সমস্ত আইনসভাকে

হিরোশিমা নাগাসাকি করিয়া দিয়াছি। বেটারা বসিয়া থাকুক এখন কচু মুখে দিয়া।

আমি : আপনারা ৯২ নম্বরের বোমা মারিয়া আইন সভা বাতিল করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনারা মন্ত্রী আছেন কিরূপে ?

উযিরে-আযম : আমরা ক্যাবিনেট-অব-ট্যালেণ্টস কায়েম করিয়াছি। এতে আইন-সভার কোন দরকার হয় না।

আমি : এ সব যে আপনারা করেন, তাতে আপনেরার শাসনতন্ত্রের বিধান ভংগ হয় নাই ?

উযিরে-আযম : (হো হো করিয়া হাসিয়া) শাসনতন্ত্র ? কিসের শাসনতন্ত্র ?

আমি : (বিস্ময়ে চোখের ভুরু কুঞ্চিত করিয়া) কেন, আপনেরার দেশে কোন শাসনতন্ত্র নাই ?

উযিরে-আযম : তুমি কি পাগল হইয়াছ ? না আমরারে পাগল ঠাওরাইয়াছ ? আমরা শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া কি নিজেরার গলার ফাঁসি তৈয়ার করিব ? তা আমরা এতদিনেও করি নাই। ভবিষ্যতেও করিব না। শুধু আমরাই ইচ্ছা মত দেশ শাসন করিব, এটাই এ দেশের শাসনতন্ত্র। এটাই এ দেশের আইন।

আমি বুঝিলাম, হ্যাঁ বুদ্ধিমানের দেশ বটে। আল্লাহ এ-দেশবাসীকে কদে ছোট করিয়াছেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে বড় করিয়াছেন। এদের তালুর চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত সবটাই মগযে ভরা। এরা দেহে বাউন হইলেও মনে এরা দেও।

এদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করা আমি সাব্যস্ত করিলাম। আমার দেশ ভ্রমণের বাতিক স্থায়ীভাবে সারিয়া গেল।

আমি এখন হইতে গৃহী হইলাম।

জুলাই, ১৯৫৪।

শিক্ষা সংস্কার

প্রথম দৃশ্য

(মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর চেম্বার। মন্ত্রী সাহেব তাঁর ঘূর্ণায়মান চেয়ারে উপবিষ্ট। সামনে গ্লাস-টপড বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের তিন পাশ ঘেরিয়া সারি-সারি চেয়ার। সে সব চেয়ারে অনেক ভদ্র-লোক বসিয়া আছেন। এই সব ভদ্রলোকের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেকটর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, প্রাইমারী শিক্ষার ডাইরেকটর, ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর-অব-স্কুলস, সরকারী কলেজ সমূহের প্রিন্সিপালগণ, জমিয়তে-ওলামার প্রতিনিধি অলিম, ফাযিল ও ফকিহগণ, শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং বাছা-বাছা কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও কতিপয় মাতব্বর এম. এল. এ আছেন। শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি সাহেব মন্ত্রী মহোদয়ের ডানদিকে একটু সম্মান সূচক দূরত্ব রাখিয়া বসিয়াছেন। তাঁর সামনে ফাই-লের স্তূপ। সেক্রেটারি সাহেবের ডানদিকের কোণে স্টেনোগ্রাফার তাঁর প্যাড ও পেন্সিল লইয়া হুকুম মাত্র কাজ শুরু করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন। মন্ত্রী সাহেব সম্মুখস্থ 'ব্ল্যাক-এণ্ড-হোয়াইটের' টিনের মুখ খুলিয়া হাত বাড়াইয়া যতদূর নাগাল পাওয়া যায় দুচারজনকে অফার করেন। তাঁরা মাজা ঈষৎ উচা করিয়া আদাব দিয়া এক-একটি সিগারেট গ্রহণ করেন। মন্ত্রী সাহেব নিজে একটি সিগারেট লইয়া টিনটি টেবিলের মাঝা-মাঝি রাখিয়া দিলেন এবং পকেট হইতে 'লাইটার' বাহির করিয়া বাঁ হাতের বুড়া আংগুলের টিপে আগুন ধরাইয়া মেহ-মানরার দিকে ঈষৎ হাত বাড়াইলেন। তাঁরা আবার মাথা নোয়াইয়া যাঁর-তাঁর হাতের দেয়াশলাই দেখাইয়া দিলে মন্ত্রী সাহেব নিজের সিগারেট

ধরাইয়া 'লাইটার' বন্ধ করিয়া পকেটে রাখিয়া দেন। মেহমানরা দুই-দুইজনে এক-এক কাঠি খরচ করিয়া যাঁর-তাঁর সিগারেট ধরান। মেহ-মানদের মধ্যে যাঁরা পিছনের কাতারে বসিয়াছেন, তাঁরা মন্ত্রী সাহেবের অফারের অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া নিজেরাই উঠিয়া সামনের কাতার-ওয়ালার ঘাড়ের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া কেহ একটি কেহবা একাধিক সিগারেট নিয়া 'নিজেরারে সাহায্য' করেন। চারজন আলিম-ফাযিল ও ফকিহ ব্যতীত আর সকলেই এইভাবে মন্ত্রী সাহেবের সিগারেটের সদ্ব্যবহার করেন। সভায় প্রায় সকলের মুখ হইতে যখন ধুঁয়া বাহির হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া কামরার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন মন্ত্রী সাহেব ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া সামনের এ্যাশ্‌ট্রের উপর নিজের অর্ধ-দগ্ধ সিগারেটটি সযত্নে বসাইয়া কাশিয়া গলা সাফ করিয়া বলেন)।

শিক্ষামন্ত্রী : জেণ্টলমেন প্রেযেণ্ট। আমি আপনেরারে কেন আজ এই তকলিফ দিছি, তার আভাস আপনারা সেক্রেটরি সাহেবের দাওয়াত নামাতেই পাইছেন। উদ্দেশ্যটা আমি খোলাখুলিভাবেই আপ-নেরার খেদমতে পেশ করতে চাই। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, আমরা আজ আযাদ হইছি। আপনারা এও নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আমরা আজ পাকিস্তান হাসিল করছি। (সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মুখে বিস্ময়ের ভাব। তাঁরার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি। মন্ত্রী সাহেবের একটু দম গ্রহণ।) কিন্তু এই আযাদির কোনও অর্থ থাকবে না, এই পাকিস্তান হাসিল ব্যর্থ হৈয়া যাবে, যদি আমরা আমরার শিক্ষা পদ্ধতিকে ইসলামী করতে না পারি। আপনারা, আশা করি, অবগত আছেন যে, শিক্ষাই জাতির তহযিব-তমদ্দুনের বুনিয়াদ। শিক্ষা-পদ্ধতি যদি ইস্‌লামী না হয়, তবে তমদ্দুনও ইস্‌লামী হবে না। প্রশ্ন এই যে, আমরার বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি, এর কারিকুলাম, এর সিলেবাস ইসলামী কি না। এ সম্পর্কে আপনেরারে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমি আমার পবিত্র কর্তব্য মনে করি যে, অমুসলমান ইংরাজ শাসনে আমরার তহযিব ও তমদ্দুন বিপন্ন হইছিল বৈলাই আমরা আযাদি চাইছিলাম এবং সংখ্যাগুরু হিন্দুরার

সাথে একক্ষেত্রে থাকলে সে বিপদ আরও ঘোরতর হৈয়া উঠবে বৈলাই আমরা স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবি করছিলাম। আমরার এও মনে রাখতে হবে যে, অখণ্ড ভারতে হিন্দু-প্রাধান্যে ইসলামী তহযিব-তমদ্দুনের উন্নতি হাসিল করা যাবে না বৈলাই আমরা পাকিস্তান কায়েম করছি। অতএব, এটা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট যে, ইংরাজের সৃষ্ট, হিন্দু-প্রাধান্যে লালিত-পালিত এই শিক্ষা-পদ্ধতি কিছুতেই ইসলামী শিক্ষা-পদ্ধতি হৈতে পারে না। কাজেই এই শিক্ষা-পদ্ধতিকে পদাঘাতে চুরমার কৈরা ইসলামের ছাঁচে ঢাইলা নূতন শিক্ষা পদ্ধতি রচনা করতে হবে। আমরা আজ সে সুযোগ পাইছি। আজ আমরা ইংরাজের গোলামি ও হিন্দুর প্রভাব হৈতে সম্পূর্ণ আযাদ হইছি। ইসলামী তহযিব ও তমদ্দুনকে আমরার জীবনে রূপায়িত করবার, প্রকৃত মুসলমানরূপে জীবনযাপন করবার অপূর্ব সুযোগ আমরা লাভ করছি। এ সুযোগ আমরা হেলায় হারা'তে পারি না। (একটু থামিয়া চারিদিক চাহিয়া) সাহেবান, এই বিরাট দায়িত্ব দেশবাসী, অবশ্য আল্লাহতালার ইচ্ছাতেই, আমার কাঁধে চাপাইছে। আপনেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, এত বড় মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আমার নাই, মানে, আমার একার নাই। সে জন্য আমি আপনেরা শিক্ষা-বিদদেরে এবং আপনেরা ওলামায়েদিনকে এই সভায় দাওয়াত করছি। আপনেরার সাহায্য সহযোগিতা ও মূল্যবান উপদেশ পা'লেই আমি এই মহান দায়িত্ব পালনে সমর্থ হব। আজকার এই সভার উদ্দেশ্য, সুতরাং, খুবই গুরুতর। আমি আশা করি, আপনেরা এই উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি কৈরা আপনেরার যাঁর-তাঁর কর্তব্য পালন করবেন। (বসিবার উপক্রম করিয়া পুনরায় সোজা হইয়া) হ্যাঁ, এখানে আমি উল্লেখ না কৈরা পারিতেছি না যে, ইন্‌স্পেকট্রেস-অব-স্কুলস ও উইমেন্‌স কলেজের প্রিন্‌সিপাল সাহেবাকেও এই মিটিং-এ দাওয়াত করা হইছিল। কিন্তু জমিয়তে-ওলামার প্রতিনিধিরা বেগানা আওরতের সংগে এক মিটিং-এ জমায়েত হওয়া ইসলামী তহযিবের বরখেলাফ বৈলা আপত্তি উত্থাপন করায় আমি তাঁরার দাওয়াত ক্যানসেল করছি এবং তাঁরার বক্তৃতা

লেইখা পাঠাবার জন্য তাঁরারে অনুরোধ করছি। (জমিয়ত প্রতিনিধিগণের কোণ হইতে মারহাবা-মারহাবা ধ্বনি। মন্ত্রী মহোদয়ের শির নোয়াইয়া হাসিমুখে তাঁরার 'মারহাবা' গ্রহণ) অতএব মাননীয় হাযিরানে-মজলিস, আমরার জাতির ও আমরার ইসলামের জীবন-মরণের এই প্রশ্নে আপনেরা আপনেরার সুচিন্তিত ও মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করবেন, এই আরয কৈরাই আমি আসন গ্রহণ করলাম।

(মন্ত্রী সাহেব বসিয়াই সেক্রেটারি সাহেবের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন; মানেটা: কেমন হইল? সেক্রেটারি প্রশংসা-সূচক স্মিত হাস্য ও অনুমোদন-সূচক গ্রীবা আন্দোলন করিলেন; মানেটা: চমৎকার। মন্ত্রী সাহেব খুশী হইয়া আরেকটা সিগারেট ধরাইলেন। সভা নিস্তব্ধ। তারপর ফিসফিস, কানাকানি। অবশেষে পার্শ্ববর্তী কয়েকজনের পীড়াপীড়িতে ভাইস-চ্যান্সেলার সাহেব দাঁড়াইলেন।)

ভাইস চ্যান্সেলার: পাকিস্তানের শিক্ষায় ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তন করতে হবে, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। তবে আমার মনে হয়, প্রাইমারি স্তরে শিক্ষার্থীদেরে দিনিয়াত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করলেই আমরার উদ্দেশ্য সফল হবে। কারণ, মানব-চরিত্রের ঐটাই ফর্মেটিভ পিরিয়ড। প্রাইমারি স্তরে আমরা শিক্ষার্থীকে যে ধর্ম-বিশ্বাস শিক্ষা দিব, বাকী জীবন সে তদনুসারেই চলবে। তবে, এ ব্যাপারে ডিরেক্টর-অব-প্রাইমারি এডুকেশন সাহেবের মত কি, তা অবশ্য জানা দরকার।

ডি. পি. ই.: প্রাইমারি স্তরে নমায-রোযা, মসলা-মসায়েল শিক্ষা দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তরল-মতি বালক বালিকাদেরে দিনিয়াতের সব কথা অর্থাৎ কিনা এই ধরুন যেমন হায়েয-নেফাসের ও ফরয গোসলের মসলা শিক্ষা দেওয়ায় আমার আপত্তি আছে।

জমিয়ত-প্রতিনিধি: (বাধা দিয়া) ডি. পি. ই. সাহেব বালিকা পাইলেন কোথায়? তবে কি মেয়েরারে পর্দার বাইরে স্কুলে পাঠাবার বর্তমান কুপ্রথা বজায় রাখা হবে?

মন্ত্রী: অর্ডার, অর্ডার, মওলানা সাহেব, পর্দার কথা পরে আলোচনা

হবে। দিনিয়াত শিক্ষা কোন্ স্তরে দেওয়া হবে, এখন শুধু সে কথারই আলোচনা হৈতেছে। ডি পি. ই. সাহেব কি বলতেছিলেন ?

ডি. পি. ই.ঃ আমার বিবেচনায় হায়েয-নেফাসের ও ফরয গোসলের মসলা সেকেণ্ডারি স্তরে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। কেবল তখনই ছাত্ররা ওসব কথা বুঝতে পারবে। অবশ্য এ ব্যাপারে সেকেণ্ডারি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেবের অভিমত জানা দরকার।

পি. এস. বি.ঃ যে কারণে ডি. পি. ই. সাহেব প্রাইমারি স্তরে হায়েয-নেফাস ও ফরয গোসলের মসলা শিখাতে আপত্তি তুলছেন, সেকেণ্ডারি স্তরেও সে আপত্তির কারণ বিদ্যমান। সেকেণ্ডারি স্তরের শিক্ষার্থীরাও তরল মতি। আমার বিবেচনায় কলেজ-স্তরেই ঐ সব মসলা-মসায়েল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ ও-সব কথার ভাল-মন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসলে কলেজ স্তরেই হৈয়া থাকে।

ভাইস-চ্যান্সেলারঃ ডি. পি. ই. ও পি. এস. বি. সাহেবান দিনিয়াত শিক্ষাকে যে ভাবে উপরের দিকে ঠেইলা-ঠেইলা কলেজ স্তরে নিয়া ঠেকাইছেন, তাতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই দিনিয়াত শিক্ষা হৈতে বঞ্চিত থাকবে। কারণ আমরার শিক্ষার্থীরার শতকরা মাত্র ১৮ জন মাধ্যমিক স্তর পার হৈয়া কলেজ-স্তরে প্রবেশ করতে পারে।

জমিয়তঃ দেখুন সাহেবান, আপনেরা আমার গোস্তাখি মাফ করবেন। আপনেরা ওসুল ঠিক না কৈরাই তফসিল নিয়া টানাটানি করতেছেন। আমি আগেই সে জন্য ওসুল ঠিক করতে চাইছিলাম। আমি কইতে চাই যে, মেয়েরার শিক্ষার বর্তমান বেপর্দা কুপ্রথা বন্ধ করার বিষয় আগে ঠিক হোক। এটা ওসুলের কথা। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী সাহেব আমার এই গুরুতর যরুরী কথাটা বলতে না দিয়া আমারে বসাইয়া দিছিলেন।

মন্ত্রীঃ (প্রতিবাদ করিয়া) না না আপনেরে আমি বসাইয়া দেই নাই ত। আমি কইছিলাম, ও-বিষয়ে পরে আলোচনা হৈব।

জমিয়তঃ সে একই কথা হৈল। আওরতের পর্দা-আবরুর ব্যবস্থা না কৈরা শিক্ষারে আপনেরা ইসলামী করবেন কিরূপে, তা আমি বুঝতে

পারতেছি না। আপনেরা শুধু দিনিয়াত শিক্ষার কথা আলোচনা কর তেছেন। এটা তফসিলের কথা, ওসুলের কথা এটা না। শুধু দিনিয়াত শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই শিক্ষা-পদ্ধতি ইসলামী হৈয়া যাইব? না, তা হৈব না। নাস্তিক-নাসারারা সায়েন্স, ফাল্‌সাফা, জিয়োগ্রাফিয়া ওগায়রা বিভিন্ন নামে যে সব বেশরা, গায়ের-ইসলামী, কুফরী শিক্ষার ব্যবস্থা কৈরা গেছে, এ সব কুফরী ও শেরেকী শিক্ষার আবর্জনা দূর না করা পর্যন্ত শিক্ষা-পদ্ধতি কিছুতেই ইসলামী হৈতে পারে না। এসব কুফরও শিখাইবেন, আর তার সংগে কিছু-কিছু দিনিয়াতও পড়াইবেন, এই জোড়াতালিতে শিক্ষা-পদ্ধতি ইসলামী হৈব না। না সাহেবান, ইসলাম শেরক্ ও কুফরের সংগে কোন দিন আপোস করে নাই। ইসলামী শিক্ষা-পদ্ধতিও কুফরী শিক্ষা-পদ্ধতির সাথে আপোস করতে পারে না।

(জমিয়ত-প্রতিনিধির এই ওজস্বিনী বক্তৃতায় সভা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। কারও মুখে রা নাই। শিক্ষা-মন্ত্রী সাহেব পর্যন্ত ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেলেন। তিনি সেক্রেটারি সাহেবের দিকে অসহায় করুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। সেক্রেটারী সাহেব সভার দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া আস্তে-আস্তে হাতের সোনালী পার্কার-৫১ কলমটি বন্ধ করিলেন এবং ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

সেক্রেটারি: মওলানা সাহেব কি তবে আমরার শিক্ষা হৈতে জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়া একেবারে উঠাইয়া দিতে চান?

জমিয়ত: (মুচকি হাসিয়া) আমি জ্ঞান উঠাইবার কথা বলি নাই, বলছি বিজ্ঞান উঠা'বার কথা।

সেক্রেটারি: বেশ ত বিজ্ঞানের কথাই ধরা যাক। বিজ্ঞান পড়া বেশরা হৈল কেমন কৈরা? বিজ্ঞান ত আমরারে আল্লার অফুরন্ত কুদরতের কথাই শিক্ষা দেয়।

জমিয়ত: বে-আদবি মাফ করবেন সেক্রেটারি সাহেব। বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় আল্লার কুদরতের কথা? একথা আপনার মুখে ভালই মানাইছে। নাসারার পোশাক আজও ছাড়তে পারেন নাই, নাসারার আকিদা

াড়.বন কেমন কৈরা ? (সেক্রেটারি সাহেবের সুন্দর টাই, ভেস্ট ও ধোপ-দুরস্ত কোটের দিকে বক্তা ও অন্যান্য সকলের নযর পড়িল। সাহেবী পোশাকপরা অন্যান্য সদস্যেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সকলের মুখেই লজ্জা লজ্জা ভাব। জমিয়ত-প্রতিনিধি বিজয়-গৌরবে হাসিমুখে বলিতে লগিলেন) ভাই সাহেবান, যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টি করেন নাই, অণু-পরমাণু হৈতে দুনিয়া সৃষ্টি হইছে, (নাউযুবিল্লাহি-মিন-যালিক), যে বিজ্ঞান বলে যে আদম হৈতে মানুষের সৃষ্টি হয় নাই, হইছে বানর হৈতে, সেই বিজ্ঞান আল্লার কুদরত শিক্ষা দেয় ? না সাহে-বান, এই ধরণের আকিদা নিয়া কেউ ইসলামী শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারবেন না। ইসলামী শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা করতে হৈলে আগে আমরারে ঈমানে-আকিদায় সুরতে-সিরতে পুরা মুসলমান হৈতে হবে।

(মওলানা সাহেবের এই অকাট্য যুক্তির জবাব সেক্রেটারি সাহেব দিতে পারিলেন না। জবাবে যে-সব কথা তাঁর মনে আসিল, তার একটাও পাকিস্তানে বলা চলে না। কাজেই সেক্রেটারি সাহেবের গলা শুকাইয়া আসিল। তিনি কেবলি ঢোক গিলিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি মাথা হেঁট করিয়া সম্মুখস্থ কাগয-পত্র নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। উপস্থিত প্রায় সকলের মুখ শুকনা। শুধু আলেমরার উৎসাহ-সূচক কানাকানি। অবশেষে এই অশোভন নিস্তব্ধতা ভংগ করিয়া যিনি দাঁড়াইলেন, তিনি পি. এস. বি. সাহেব। সরকারী প্রতিনিধিরার মধ্যে একমাত্র ইহারই পরনে কোট-প্যাণ্টলুন ছিল না। তার বদলে তাঁর পরনে ছিল চোশ্‌ত পাজামা ও শিরওয়ানী। থুতির আগায় এক গোছা দাড়ি এবং মাথায় সদ্য-কেনা জিন্না-ক্যাপ। তাঁরও গলা শুকাইয়া গিয়াছিল মনে হইল। কারণ তিনি তিন-চার বার ঢোক গিলিয়া খা-খা দিয়া অবশেষে বলিলেন।)

পি. এস. বি. ঃ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মওলানা সাহেবের রাগের কারণ বুঝলাম। কিন্তু জিয়োগ্রাফির বিরুদ্ধে মওলানা সাহেবের কি বলবার আছে ?

জমিয়ত ঃ এটাও কি বুঝাইয়া বলতে হবে ? বড়ই আপসোসের বিষয়, নাস্তিক-নাসারার শিক্ষায়, বেয়াদবি মাফ করিবেন সাহেবান, আপনেরার

সিনায় কুলুপ পৈড়া গেছে। নইলে এই সাধারণ কথাটা বুঝাইয়া বলতে হয়? কেন 'ভূগোল' কথাটাই কি ইসলামের খেলাফ নয়? ভূগোল বলে দুনিয়াটা গোলাকার, সুরুজ উদয়-অস্ত হয় না; সে এক জায়গায় স্থির হৈয়া আছে। এসব শিক্ষা কি কোরআনের খেলাফ না? আর শুধু কোরআনের কথাই বা বলি কেন? মানুষের একটা কাণ্ড-জ্ঞান থাকা চাই ত? ভূগোল শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়াটা লাটিমের মত ঘুরতেছে। শুইনা হাসি পায়। এই সব গাজাখোরি কথা বিশ্বাস করবার লোকও আছে দেইখা দুঃখও হয়। এসব পণ্ডিত-মুর্খেরা এই সাধারণ কথাটা বুঝে না যে, সত্যই যদি দুনিয়া ঘুরত, তবে আমরা ছিট্‌কিয়া পৈড়া যা'তাম।

ভাইস চ্যান্ঃ দেখুন মওলানা সাহেব, মাধ্যাকর্ষণ নামে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যার জোরে—

জমিয়ত ঃ (বাধা দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া) দেখুন জনাব, বেআদবি মাফ করবেন, মদ-গাঁজার মধ্যেও একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। নইলে অত লোক এটা খাবার জন্য পাগল হৈব কেন? যত আকর্ষণী শক্তিই থাকুক, ও-সব কুফরী কালাম ছাড়তেই হবে। হাদিস শরিফে আসছে, শয়তানের ওয়াসওয়াসার আকর্ষণী শক্তি অতিশয় প্রবল। তাই বৈলা সে আকর্ষণী শক্তির সামনে টিইকা থাকতে হৈব না? যে বা যারা তা পারব না, তার বা তারার স্থান পাকিস্তানে হবে না। এটা সাফ কথা।

জমিয়তের সমস্ত আলিম-ফাযিল ও ফকিহ্‌গণ এবং কতিপয় এম. এল. এ. (সমস্বরে চিৎকার করিয়া)ঃ চৈলা যান, হিন্দুস্তানে চৈলা যান। সেখানে গিয়া কুফরের আকর্ষণী শক্তি খুবতেরেস আস্বাদন করতে থাকুন।

(ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব অগত্যা বসিয়া পড়িলেন। অন্য কেহই পাকিস্তানে থাকিয়া শরিয়তবিরোধী মাধ্যাকর্ষণ বা অন্য কোন আকর্ষণের পক্ষে কোনো কথা বলিতে সাহস করিলেন না। সকলেই যার-তাঁর চেয়ারের তীব্র আকর্ষণী শক্তিতে আটকাইয়া রহিলেন। ফলে সভা শান্ত-এমনকি স্তব্ধ, হইয়া রহিল। মন্ত্রী মহোদয় সেক্রেটারির সহিত দৃষ্টি বিনিময়

করিলেন। সেক্রেটারি সাহেবের ইশারায় অবশেষে মন্ত্রী সাহেব দাড়াইলেন।)

শিক্ষা মন্ত্রী : ভাই সাহেবান, আপনেরা আপনেরার আজকার পবিত্র দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হৈবেন না। মনে রাখবেন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ, ইসলামের ভবিষ্যৎ আপনেরারই উপর নির্ভর করতেছে। মত-ভেদ মানুষে-মানুষে হৈয়াই থাকে। তাই বৈলা মত-ভেদের দরুণ উত্যক্ত হৈয়া আজ যদি আপনেরা আজকার এই মহান দায়িত্ব পালনে বিরত হন, তবে ইতিহাসের কাছে, ইসলামের কাছে, আল্লাহ-তালার দরবারে, আপনেরা দায়ী থাকবেন।

জমিয়ত : আমরা দায়িত্ব এড়াইলাম কোথায়? সুষ্ঠুরূপে দায়িত্ব পালনের জন্যই ত আমরা যার-তাঁর মনের কথা খুইলা বলতেছি।

মন্ত্রী : সে জন্য আপনেরা আমার শুকরিয়া জানবেন। কিন্তু আলোচনা ক্রমেই যেরূপ অপ্রিয় হৈয়া উঠতেছে, তাতে আমার আশংকা হয়, আপনেরা শেষ পর্যন্ত একমত হৈতে পারবেন না।

জমিয়ত : আল্লাহ-রসুলের হুকুম-আহকাম মাইনা চলতে হৈব। যারা তা করবেন না তাঁরার সাথেও একমত হৈতে হৈব, তার কোনো মানে নাই।

মন্ত্রী : সেটা ঠিক। কিন্তু ঐক্য বজায় রাখবার চেষ্টা ত করতে হৈব? আমার প্রস্তাব এই যে, আমরা অনেক লম্বা আলোচনা কৈরা সকলেই ক্লান্ত হৈয়া পড়ছি। আজ এই সভায় আমরা একটি সাব-কমিটি গঠন কৈরা দিয়াই আজকার মত সভার কাজ শেষ করি। সেই সাব-কমিটি শিক্ষার আমূল সংস্কার সম্বন্ধে একটি স্কীম তৈয়ার কৈরা আমার নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করবেন। আমি তৎপর আপনেরার এক সভা ডাইকা সেই রিপোর্ট আপনেরার খেদমতে পেশ করব। কি বলেন আপনেরা? এতে কারো আপত্তি আছে?

অধিকাংশে : জি না, এতে আমরার কোনও আপত্তি নাই।

জমিয়ত : কিন্তু হুযুর আমার একটা আরয আছে।

মন্ত্রী : (ঘাবড়াইয়া গিয়া) কি, সাব-কমিটি গঠনে আপনার আপত্তি

আছে? কি আপত্তি।

জমিয়ত: জি না, ঠিক আপত্তি আছে, একথা বলা যা'তে পারে না। আমার শুধু একটা আরয আছে। আমার আরযটা এই যে, ইসলাম সম্বন্ধে যারা ওয়াকিফহাল, সিরতে-সুরতে যারা খাঁটি মুসলমান, তাঁরাই কেবল সাব-কমিটির মেম্বার হৈতে পারবেন।

মন্ত্রী: সিরতে আমরা সকলেই খাঁটি মুসলমান। সুরতে অবশ্য হে-হে-হে—

(দাড়িহীন, সাহেবী পোশাক-পরা মেম্বররার দিকে এবং নিজের দিকে নযর ফিরাইয়া মন্ত্রী সাহেব অবশেষে বলিলেন)।

মন্ত্রী: মাওলানা সাহেব, সিরত ও সুরতের মধ্যে কোন্‌টা বড় আর কোন্‌টা ছোট, তা নিয়া বাহাস কৈরা সময় নষ্ট করতে আমি চাই না। কিন্তু সকল দিক বিবেচনা কৈরা সুরত সম্বন্ধে আপনেরা যদি একটু কনসেশন করেন, তবে ভাল হয়, মানে, সাব-কমিটি গঠনটা একটু সহজ হয়।

জমিয়ত: ঠেকা বশতঃ সুরত সম্বন্ধে কিছুটা কন্‌সেশন দেওয়ার হুকুম হাদিসে আছে। আমরা আপনার অনুরোধে সে কন্‌সেশন করতে রাযী আছি। কিন্তু এক শর্তে।

মন্ত্রী: কি সে শর্ত?

জমিয়ত: সাব-কমিটিতে আলেমরার মেজরিটি হওয়া চাই।

মন্ত্রী: (অপর সকলের দিকে চাহিয়া) কি বলেন আপনেরা? আলেমরারে মেজরিটি দিতে আপনেরার আপত্তি আছে?

ভাইস চ্যান্‌: আপত্তি ত নাই-ই, বরঞ্চ আমার মত এই যে শুধু আলেমরারে নিয়াই সাব-কমিটি গঠন করা হোক। ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে গায়ের-আলেমরার বলবারই বা কি আছে?

জমিয়ত্: ভাইস চ্যান্‌সেলার সাহেব রাগের বসে একথা বলতেছেন।

মন্ত্রী: না, না, সকল দলের লোকই সাব-কমিটিতে থাকা উচিত।

জমিয়ত: তবে আলেমরার মেজরিটি।

মন্ত্রী : তা ত বটেই।

(আলেমরার মেজরিটিতে সাব-কমিটি গঠন করিয়া সেদিনকার মত সভা ভংগ হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি সাহেবের চেম্বার। শিক্ষা-সংস্কার সাব-কমিটির বৈঠক। মেম্বাররার অধিকাংশই সুরতে খাঁটি মুসলমান। স্বয়ং সেক্রেটারি সাহেব আজ সুট বাদ দিয়া মুসলমানী লেবাস অর্থাৎ চোশত পাজামা ও শিরওয়ানী পরিয়াছেন। দাড়ি অবশ্য রাখেন নাই, তবে মাথায় টুপি পরিয়াছেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি সাহেবকে সাব-কমিটিতে কোঅপ্ট করা হইয়াছে। তিনিও সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। সকলে উপস্থিত হইয়াছেন কি না, সেটা তালিকার সহিত মিলাইয়া লইয়া সেক্রেটারি সাহেব আলোচনা শুরু করিলেন)

সেক্রেটারি : সাহেবান, সেদিনকার সভায় এই সাব-কমিটির উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইছে, তা অত্যন্ত গুরুতর, সে কথা আপনেরারে বুঝাইয়া বলার দরকার নাই। শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনা কৈরা রিপোর্ট তৈরী করা যে কত বড় দায়িত্ব, তা বৈলা শেষ করা যায় না। এই গুরু দায়িত্বের ভার আমরার উপর ন্যস্ত কৈরা আমরার প্রতি যে আস্থা প্রদর্শন করা হইছে, আমরারে যে গৌরব দেওয়া হইছে, সেই আস্থা ও সেই গৌরবের মর্যাদা আমরার রক্ষা করতেই হবে। এই জটিল ব্যাপারে আপনেরার আলোচনার সুবিধার জন্য আমি মোটামুটি একটা রিপোর্টের মুসাবিদা খাড়া করছি। আপনেরার অনুমতি হৈলে সেটা আমি পৈড়া শুনাইতে পারি।

আলিম (জমিয়ত-প্রতিনিধি) : সেদিনকার মূল সভায় যে সব মূলনীতি নির্ধারিত হইছিল, আপনের রিপোর্ট কি সে সব মূলনীতি ভিত্তি কৈরাই রচিত হইছে?

সেক্রেটারী ঃ সেদিন ত কেবল বিভিন্ন মতই প্রকাশিত হইছিল, কোনো নীতি ত নির্ধারিত হয় নাই।

ফাযিল (জমিয়ত-প্রতিনিধি) ঃ বলেন কি সাহেব? মূলনীতি নির্ধারিত হয় নাই, তবে কি হইছিল?

লীগ সভাপতি ঃ দেখুন, আমি সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই কি আলোচনা তাতে হইছিল তাও জানি না। কিন্তু আমরার শিক্ষার মূলনীতি নির্ধারিত হয় নাই, সেক্রেটারি সাহেবের একথা আমি মানতে পারি না। আমরার শিক্ষার মূলনীতি সেদিনকার সভার কি হৈয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ আমরার শিক্ষার মূলনীতি কি হৈয়া রইছে চৌদ্দ শ বছর আগে। আমরা মুসলমান। আমরার ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফ; উহাই হৈব আমরার সমস্ত শিক্ষার বুনিয়াদ ও মূলনীতি। ভাল কৈরা কোরআন শরিফ পড়াইবার বন্দোবস্ত করুন। আর কিছুই পড়াবার দরকার হৈব না। কোরআন আল্লার কালাম। দুনিয়াতে এমন কোন শিক্ষণীয় বিষয় নাই, এমন কোনো জ্ঞান নাই, যা কোরআনে পাবেন না।

ডাঃ চ্যান্ ঃ লীগ-সভাপতি মওলানা সাহেবের সহিত এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নাই। কোরআন শরিফ নিশ্চয় পড়ান হৈব। কিন্তু আমরার আজকার আলোচ্য বিষয় শিক্ষা-পদ্ধতি কি হৈব, কারিকুলাম অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় কি হৈব, সে সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট তৈয়ার করা। সিলেবাস কি হৈব অর্থাৎ কি কি বই পড়ান হৈব, সেটা আজকার আলোচ্য বিষয় না। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই আমরার সীমাবদ্ধ থাকতে হৈব ত?

এম. এল এ. ঃ কারিকুলাম সিলেবাস এসবই পুরাতন কথা। ইংরাজ আমলে ও-সব ত ছিলই। আমরার আলোচনা যদি ওরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব, তবে আর আমরা পাকিস্তান হাসিল করলাম কেন? সাহেবান কারিকুলাম সিলেবাস ইত্যাদি গায়ের-ইসলামী কথা ছাড়ুন, ইসলামী তহযিব-তমদ্দুনের কথা বলুন।

ডি. পি. আই. ঃ ইসলামী শিক্ষার মধ্যে কি কোনো কারিকুলাম থাকব না? তবে থাকব কি?

আলিম ঃ নিসাব থাকব। আপনেরা বুঝি মনে করেন কারিকুলাম ছাড়া শিক্ষা হৈতে পারে না?

ডি. পি. আই. ঃ আমি তা মনে করি না। আমার বক্তব্য এই যে, কারিকুলামই বলুন, আর নিসাবই বলুন, সেটা আমরার আগে ঠিক করতে হৈব ত?

লীঃ সঃ ঃ কি ঠিক করতে হৈব, নিসাব? বলেন কি জনাব? নিসাব আমরার ঠিক হৈয়া আছে চৌদ্দ শ বছর আগে।

ডাঃ চ্যান্ ঃ (বিরক্তিমাখা স্বরে) শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিক হৈয়া আছে চৌদ্দ শ বছর আগে, নিসাব ঠিক হৈয়া আছে চৌদ্দ শ বছর আগে, তবে আর আমরা এখানে আসছি কি করতে?

লীঃ সঃ ঃ (সমান উত্তেজিত স্বরে) চৌদ্দ শ বছর আগে যা ঠিক হৈয়া আছে, তা বুঝবার জন্য।

ডাঃ চ্যান্ ঃ (আত্মসমর্পণের ভাবে চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িয়া) বেশ, তবে তাই সবাইকে বুঝাইয়া দিন।

লীঃ সঃ ঃ এতদিনেও যখন বুঝেন নাই, তখন আজ কি আর বুঝতে পারবেন আপনেরা? যার হয় না নয় বছরে, তার হয় না নব্বই বছরে।

সেক্রেটারি ঃ দেখুন সাহেবান, আমরা যদি ঝগড়া-বিবাদ কৈরা সময় কাটাই তবে কাজ করব কখন?

লীঃ সঃ ঃ ঝগড়া আমি করতেছি না। আমি শাশ্বত সত্য কথাই বলতেছি।

সেক্রেটারি ঃ সকলে ত আর সমান জ্ঞানী নন। আপনারা যাঁরা জ্ঞানী লোক এখানে তশরিফ আনছেন, তাঁরার কর্তব্য সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া। সেজন্যই আপনেরারে দাওয়াত করা হইছে।

লীঃ সঃ ঃ আচ্ছা, তবে শুনুন। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র ত?

সেক্রেটারি ঃ ঠিক।

লীঃ সঃ ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী শিক্ষাই দিতে হৈব ত ?

সেক্রেটারি ঃ কোনো সন্দেহ নাই।

লীঃ সঃ ঃ কোরআন-হাদিস না পড়লে ইসলামী শিক্ষা হৈতে পারে না, এটা ঠিক ত ?

আলিম ঃ তা ঠিক, তবে ঐ সঙ্গে ফেকাহ-ওসুলও পড়া'তে হৈব।

লীঃ সঃ ঃ থামুন আপনি, কথার মুখে কথা বলবেন না। কোরআন-হাদিস শিক্ষার ব্যবস্থা আগে হোক, তারপর অন্য কথা।

ফাযিল ঃ আলিম সাহেব ঠিক কথাই বলছেন। ঐ সংগে-সংগেই ফেকাহ ওসুল পড়াইতে হৈব। ফেকাহ-ওসুল ছাড়া কোরআন-হাদিস বোঝা সম্ভব না।

লীঃ সঃ ঃ কে বলছে সম্ভব নয় ? কেন সম্ভব নয় ? যখন ফেকাহ-ওসুল ছিল না, তখন কি কোরআন-হাদিস কেউ বুঝত না ?

আলিম ঃ না, বুঝত না। বুঝত না বৈলাই ত ফেকাহ-ওসুলের সৃষ্টি।

লীঃ সঃ ঃ নাউযুবিল্লাহি মিন-যালিক। দেখুন, আলিম সাহেব, আপনারা ফেকাহ-ফেকাহ কৈরাই যত অনিষ্ট করছেন। হাদিস-কোরআন ফেইলা যেদিন মুসলমানরা ফেকাহ ও ওসুল ধরছে, সেইদিন হৈতেই ইসলামের এই দুর্দশা শুরু হইছে।

ফাযিল ঃ লীগ সভাপতি সাহেব, আপনে আমরার সামনে ফেকার নিন্দা করবেন না। আপনার মযহাবী খেয়ালাত আমরার জানা আছে। আপনাকে আমরা লীগ সভাপতি করছি বৈলাই আপনে বুছি মনে করেন, আপনেরে আমরা ইমামও বানা'ব ? শরিয়ত সম্বন্ধে আমরা আপনার কায়েল নই, তা আপনি জানেন।

সেক্রেটারি ঃ (মুচকি হাসিয়া) আপনেরা এখানে মযহাবী তর্ক তুলবেন না। পাকিস্তানে সব মুসলমানই সমান। বিশেষতঃ আজ আমরা জমায়েত হইছি শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিক করতে, মযহাবী কলহ করতে আমরা এখানে আসি নাই। আসল কথা, শুধু কোরআন-হাদিস পড়া'-লেই চলবে না, ফেকাহ-ওসুলও পড়া'তে হৈব। এই ত কথা ?

আলিম ও ফাযিল : (সমস্বরে) ঠিক কথা, ঠিক কথা। আমরাও সেই কথাই বলতেছি।

সেক্রেটারি : ওসুল মানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান। কোরআন-হাদিস ঠিক মত বুঝতে হৈলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন সব পড়তে হৈব।

আলিম : (আবার নিরাশ হইয়া) ফেকাহ-ওসুলের মধ্যে আপনি বিজ্ঞান-দর্শন আনলেন কোথা হৈতে ?

সেক্রেটারি : কেন আপনারা ইমাম গায্যালীর দর্শন ও ইবনে-সিনার বিজ্ঞান পড়া'তে চান না ?

ফাযিল : তা না হয় পড়া'লাম, কিন্তু নাস্তিক খৃষ্টানের বিজ্ঞান-দর্শন পড়া'ব কেন ? ছেলেরারে নাস্তিক বানা'বার জন্য নাকি ?

ডি. পি. আই. : তর্কে-তর্কে আমরা অনেক সময় নষ্ট করলাম। আমরা কি আজ রিপোর্ট তৈয়ার করব না ?

আলিম : কেন করব না ? নিশ্চয় করব। কিন্তু আগে মূলনীতি ঠিক করতে হবে ত ?

ডি. পি. আই. : বেশ, বলু'ন কোন্ মূলনীতি আপনে ঠিক করতে বলেন ?

আলিম : শরিয়ত-বিরোধী বিজ্ঞান-দর্শন ও ভূগোল পড়ান হৈব না।

ডি. পি. আই. : আচ্ছা, তারপর ?

আলিম : মেয়েরারে স্কুল-কলেজে পড়ান হৈব না।

সেক্রেটারী : কিন্তু ডাক্তারি ও নার্সিং না শিখা'লে হাসপাতাল চলবে কেমনে ? আওরতের চিকিৎসা করব কে ?

আলিম : আওরতের আবরু-ইয্যত নষ্ট কৈরা ডাক্তারি ও নার্সিং শিক্ষা দিতে হৈব ? চিকিৎসার জন্য ? শুইনা হাসি পায়। হায়াত-মওত, রিযিক-দওলত এই চারি চিজ আল্লাহ নিজের হাতে রাখছেন। চিকিৎসা কৈরা কেউ কারো হায়াত দিছেন, একথা আপনেরা কোনো দিন শুন-ছেন ? এরই জন্য আওরতের আবরু-হুরমত নষ্ট কৈরা তারারে বেগানা পুরুষের সামনে বার করতে হৈব ? কি যে বলেন আপনেরা সাহেবান,

আপনেরার কথার কোনো আগা-মাথা পাই না। ইংরাজী শিইখা আপনেরার আকিদা একেবারে খৃস্টানী হৈয়া গেছে।

সেক্রেটারি : (বিষম লজ্জিত হইয়া) না, আর আপনেরার সাথে তর্ক কৈরা সময় নষ্ট করব না। ইসলামী রাষ্ট্রে ওলামায়ে-দিনের কথা না মাইনা উপায় নাই। তা, আপনেরা বৈলা যান, আমি শুধু নোট কৈরা নেই। শুধু আলিম-ফাযিলরার সুপারিশ মত কারিকুলাম ও শিক্ষা-পদ্ধতি রচিত হোক। আপনেরা আর কেউ কিছু বলতে পারবেন না। (সাব-কমিটির অন্যান্য মেম্বারার দিকে তাকাইয়া) কি বলেন আপনেরা? কারো কোন আপত্তি আছে এতে?

সকলে : (সমস্বরে) না, না, কোন আপত্তি নাই। আপনি তাড়াতাড়ি করুন, খাবার সময় হৈয়া আসছে।

(আলিম-ফাযিল-ফকিহগণ কখনো এক-এক জন করিয়া কখনো সমবেতভাবে বলিতে লাগিলেন। সেক্রেটারি সাহেব নোট করিতে লাগিলেন। অপর সকলের কেউ নাক ডাকাইতে এবং কেউ সিগারেট টানিতে থাকিলেন। মূলনীতি, শিক্ষা-পদ্ধতি ও কারিকুলাম সম্বন্ধে মুসাবিদা খাড়া করা হইল। সেক্রেটারি সাহেবের উপর উহা ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া ফাইনাল করিবার ভার দিয়া সভা ভংগ হইল।)

তৃতীয় দৃশ্য

(শিক্ষা মন্ত্রীর চেম্বার। শিক্ষা-সংস্কার কমিটির পূর্ণ অধিবেশন। মেম্বররা সকলেই উপস্থিত মায় লীগ সভাপতি পর্যন্ত। শিক্ষা-সংস্কারের মত জটিল বিষয়ে আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে। মেম্বররার অনেকক্ষণ মাথা খাটাইতে হইবে বিবেচনায় মাননীয় মন্ত্রী সাহেব সরকারী খরচে মেম্বররার জন্য পাতলা নাস্তা ও চা-পানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'ওয়েল বিগান হাফ ডান'—নীতি কথা স্মরণ করিয়া মাননীয় মন্ত্রী সাহেব নাশতাকেই আলোচ্য বিষয়ের প্রথম আইটেম করিয়াছেন। ফিট-ফাট উর্দি-পরা

বয়-বেয়ারারা মেম্বররার হাতে-হাতেই মিঠাই-বিস্কুটের তশতরি বণ্টন করে, কারণ জায়গা এত অল্প এবং মেম্বর এত বেশী যে টিপয় বসাইবার জায়গা নাই। কিন্তু মেম্বররার তাতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। তাঁরা চেয়ারের হাতলের উপর তশতরি বসাইয়া বেশ আরামেই নাশতা সারেন। চা আসে। সিগারেট বিতরণ করা হয়। চায়ে চুমুক এবং সিগারেটে দম চলিতে লাগে। মন্ত্রী সাহেব নিজের চা টা অর্ধেক করিয়াই সিগারেট হাতে দাঁড়াইয়া উঠেন।)

মন্ত্রী ঃ হাযিরানে মজলিস, পাকিস্তানকে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে সর্বাগ্রে আমরার শিক্ষা-পদ্ধতিকে ইসলামী করতে হবে, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। এই উদ্দেশ্যে আমার গভর্ণমেণ্ট সত্যিকার ইসলামী গভর্ণমেণ্টের হাইসিয়তে এই শিক্ষা-সংস্কার কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি গত বৈঠকে শিক্ষা-সংস্কারের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে সেই আলোচনার আলোকে একটি রিপোর্ট তৈয়ারির জন্য এক সাব-কমিটি গঠন করেন। সেই সাব-কমিটি বহু গবেষণা ও চিন্তা করে একটি মূল্যবান রিপোর্ট তৈয়ারি করেছেন। আমার সুযোগ্য সেক্রেটারি এখনই সেই রিপোর্ট আপনেরার খেদমতে পেশ করবেন। আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে, আপনারা এই রিপোর্ট পসন্দ করবেন। অবশ্য আমার এ কথার অর্থ এই নয় যে, আপনারা সে রিপোর্ট সংশোধন পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারবেন না। বরঞ্চ আপনেরার স্বাধীন ও সুচিন্তিত মতামত দ্বারা রিপোর্টে প্রস্তাবিত স্কীমটি আরো উন্নত হলে আমি তাতে অধিকতর সুখীই হব। এখন আমার সেক্রেটারিকে আমি তাঁর রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ করতেছি।

সেক্রেটারি ঃ মওলায়েযম সাহেবান, এই রিপোর্ট আপনেরার খেদমতে পেশ করবার আগে শুরুতেই এ কথা আরয করে রাখা লাযিম মনে করতেছি যে, এই রিপোর্ট বস্তুতঃ আমার রিপোর্ট নয়। আসলে জমিয়তে-ওলামার আলিম-ফাযিল ও ফকিহগণ এবং গণ-প্রতিনিধি এম. এল. এ. সাহেবানই এই রিপোর্ট তৈয়ার করেছেন। আমি শুধু কেরানির

কাজ করেছি। তাঁরা যা লিখতে বলেছিলেন, তাই আমি লিখেছি। কাজেই এ মূল্যবান রিপোর্ট তৈয়ারের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরারই ও সমস্ত প্রশংসাও তাঁরারই প্রাপ্য। আমরার শিক্ষা বিভাগের প্রধানগণ, শিক্ষক-প্রফেসারগণ, কারও এতে কোন প্রশংসার দাবি নাই। কারণ তাঁরা এতে কোন কথা বলেন নাই। অর্থাৎ তাঁরার কোনো কথা শুনা আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই।

(সেক্রেটারি সাহেবের এই সরল ভদ্রতায় এবং প্রকাশ্য সভায় ঋণ স্বীকারের এই মহত্ত্বে আলিম-ফাযিলরার পান-রাঙা দন্ত বিকশিত হইল এবং তাঁরা মারহাবা মারহাবা করিতে লাগিলেন। সেক্রেটারি সাহেব শির ঝুকাইয়া সেই সব মারহাবা গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি ইংরাজীতে রিপোর্ট পাঠ করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠেট বাংলায় (কারণ এদেশের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলা জানেন না) তার তর্জমা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

সেক্রেটারি: পাকিস্তানী শিক্ষার প্রথম মূলনীতি হবে এই যে, শিক্ষার্থীদেরে শুধু ধর্ম-বিষয়ক ইলিম শিক্ষা দেওয়া হবে। ধর্ম-বিরোধী ইলিম যথা, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, খগোল পাকিস্তানে পড়ান হবে না।

সদস্যগণের অধিকাংশে: মারহাবা, মারহাবা।

সেক্রেটারি: পাকিস্তানী শিক্ষার দ্বিতীয় মূলনীতি এই হবে যে, যেসব ইলিমে খোদার খোদায়ীর উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, আল্লার প্রতি তাওয়াক্কুল নষ্ট হয়, যথা ডাক্তারি, কবিরাজি, বোটানি, জিওলজি, বায়োলজি প্রভৃতি পড়ান হবে না। তবে প্রাইভেটভাবে লোকে ইউনানী অর্থাৎ হাকিমীবিদ্যা শিখতে পারবে। কারণ হাকিমী শাস্ত্রের কিতাবগুলো আরবী ফারসীতে লেখা। ও-সব কিতাবের যদি বাংলা বা ইংরাজী তরজমা করা হয়, তবে ঐ শাস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট হবে। সে অবস্থায় হাকিমী শাস্ত্রও পাকিস্তানে পড়তে দেওয়া হবে না।

অধিকাংশে: মারহাবা, মারহাবা।

সেক্রেটারি : পাকিস্তানী শিক্ষার তৃতীয় মূলনীতি এই হবে যে, যেসব বিদ্যায় মানুষের মধ্যে পৌত্তলিকতার উন্মেষের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে যথা চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি পাকিস্তানে শিক্ষা দেওয়া হবে না। প্রকাশ থাকে যে, মন্ত্রী ও নেতারার ফটো তুলবার জন্য বিদেশ হতে অমুসলমান ফটোগ্রাফার আনা হবে। নেতারার ফটো-তুলবার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুসলমান ভাইদের কিছুতেই ফটো-গ্রাফির মত গোনার কাজ করতে দেওয়া হবে না।

সকলে : মারহাবা, মারহাবা।

সেক্রেটারি : আমরার শিক্ষার চতুর্থ মূলনীতি এই হবে যে, যেসব বিদ্যায় মানুষকে অনিত্য দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্ত করে, মানুষকে আখে-রাতের হিসাবের কথা, কেয়ামত ও দুযখের আযাবের কথা ভুলায়ে রাখে, যথা—নাচ গান বাদ্য ম্যাজিক সার্কাস ইত্যাদি পাকিস্তানে শিক্ষা দেওয়া হবে না।

অধিকাংশে : মারহাবা, মারহাবা।

সেক্রেটারি : আমরার শিক্ষার পঞ্চম মূলনীতি এই হবে যে, আওরতের আবরু হুরমত নষ্ট হয় এমন কোনো শিক্ষার, যথা বাড়ীর বাহিরে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় আওরতরার পড়ার ব্যবস্থা করা হবে না। কিন্তু নারী জাতির জন্যও ইলিম হাসিল ফরয বলে বাপ-দাদা মুরুব্বিরা মেয়েরার দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজ খরচে বাড়ীতেই বুড়া কারী ও হাফিয রেখে কোরআন শরিফ পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারবেন। গভর্ণমেন্ট তাতে কোন আপত্তি করবেন না। বরঞ্চ ঐরূপ কারী-হাফিয খোঁজ করার ব্যাপারে সরকার গার্ডিয়ানদেরে সহায়তা করবেন।

অধিকাংশে : মারহাবা, মারহাবা।

পি. এস. বি. : সেক্রেটারি সাহেব যতদূর বললেন, তাতেই আমরা বুঝলাম স্কীম ঠিকই হইছে। ইসলামের মূল রুকন পাঁচটি, সুতরাং পাকি-স্তানী শিক্ষা-পদ্ধতি মূলনীতিও পাঁচটি হওয়া ঠিকই হইছে। অতএব আর

পড়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নাই। আমরা আর না শুনেই এই স্কীম অনুমোদন করলাম।

লীঃ সঃ ঃ তা ঠিক। আমার মতেও আর পড়বার দরকার নাই। কিন্তু একটা বিষয় এখনও বুঝা গেল না অর্থাৎ শিক্ষার্থীদেরে কোন্ ভাষায় লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হবে, রিপোর্টে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। হইছে কি?

সেক্রেটারি ঃ রিপোর্টে সে কথার উল্লেখ করি নাই। কারণ তার দরকারও নাই। আমরার রাষ্ট্রভাষা উর্দুই শিক্ষার মিডিয়াম হবে, এটা ত ধরা কথা।

পি. এস. বি. ঃ আমরার কনস্টিটিউশনই এখনো রচিত হয় নাই; তবে রাষ্ট্রভাষা কবে ঠিক হয়ে গেল? আমি কন্‌সেম্‌লীর মেম্বর হয়েও ত তা জানতে পারি নাই।

লীঃ সঃ ঃ সে তর্ক এখানে তুলবার দরকার নাই। কারণ রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হোক, আর বাংলাই হোক আমরার ধর্মশিক্ষা হবে আরবীতেই। আরবী আল্লার ভাষা, কোরআন হাদিসের ভাষা। বেহেশতে আমরার আরবীতেই কথাবার্তা বলতে হবে। শুধু বেহেশতে নয়, কবরেও আমরার আরবীতেই কথা বলতে হবে। কবরে লাশ ফেলে আসা মাত্র মনকির-নকির ফেরশতা এসে জিজ্ঞাসা করবেঃ 'মার রাববুকা?' 'মান দীনুকা?' আরবী না শিখলে কি জবাব দিবেন আপনারা? অতএব আরবী না শিখে কেউ মুসলমানই হতে পারে না, বেহেশতে যাওয়া ত দূরের কথা।

সেক্রেটারি ঃ আমি আরবী শিক্ষার বিরুদ্ধতা করতেছি না। আরবী আমরার নিশ্চয় শিখতে হবে। কিন্তু আরবীও শিখতে হবে আমরার উর্দুরই মিডিয়ামে। উর্দু না শিখলে রাজকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না। অতএব পয়লা উর্দু শিখে তারপর উর্দুর মারফতে আমরা আরবী শিখব।

লীঃ সঃ ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য আজকাল হালাল রোযগার নয়। ও-সব মুসলমানরা করবে না। রাজকার্য চালাবার জন্য দরকার হলে আমরা আরবীকেই রাষ্ট্রভাষা করব। অতএব উর্দুর দরকার নাই।

কতক সদস্য ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমরা আরবীকেই আমরার রাষ্ট্র-ভাষা করব। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হয়ে যাবে।

লীঃ সঃ ঃ (উৎসাহে হাত উঠাইয়া) বলুন সাহেবান সকলেরই এই মত ত?

এক দল ঃ জি হাঁ আমরার সকলেরই এই মত।

অপর দল ঃ আমরার সকলের মত এই যে উর্দুকেই আমরার রাষ্ট্র-ভাষা করতে হবে।

লীঃ সঃ ঃ কে বললেন এ কথাটা? এমন কথা কেউ বলতে পারে? আল্লার ভাষা ছেড়ে আমরা মানুষের তৈরী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করব ইসলামী রাষ্ট্রে?

সেক্রেটারি ঃ আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করলে জনসাধারণ তা বুঝতে পারবে না। রাজকার্য অচল হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের দুর্বোধ্য ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা যায় না।

লীঃ সঃ ঃ আমরার রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হলেও এটা ইসলামী গণতন্ত্র।

ভাঃ চ্যাঃ ঃ সেক্রেটারি সাহেবের যুক্তি অনুসারেই আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাই। বাংলাই জনসাধারণের অধিকাংশের ভাষা।

সেক্রেটারি ঃ বাংলা কাফেরী ভাষা। কাফেরী ভাষাকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে কোন মুসলমান চায় না।

একদল ঃ মিথ্যা কথা, বাংলা কাফেরী ভাষা নয়, এটা মুসলমানী ভাষা। চাই, চাই, আমরা বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে চাই।

অপর দল ঃ আমরা আরবী চাই।

তৃতীয় দল ঃ আমরা উর্দু চাই।

(তুমুল হট্টগোল। সবাই কথা বলেন। কেউ কারো কথা শুনেন না। উত্তেজনায় কেউ-কেউ উঠিয়া দাঁড়ান। দেখাদেখি সকলেই দাঁড়ান। জোরে-জোরে কথা কাটাকাটি। ধমক, চোখ রাংগানি, মুখ ভেংচি। হাতাহাতি হয় আর কি? চাপরাশি দারোয়ান ও কেরানিরা পর্দা সরাইয়া ভিড় করিয়া তামাশা দেখেন। মন্ত্রী সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া

উঠিয়া পড়েন। তিনি ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া কারো-কারো কাঁধে হাত দিয়া ঠাসিয়া বসাইয়া দেন; কাকেও লক্ষ্য করিয়া জোড় হাত করেন। দু-চার জন বসেন। দেখাদেখি আস্তে-আস্তে দুই-এক করিয়া অবশেষে সকলেই বসেন। মন্ত্রী সাহেব চারদিকে চোখ বুলাইয়া নিজের চেয়ারে ফিরিয়া যান এবং বলেন)

মন্ত্রী: ভাই সাহেবান, একতাই মুসলমানদের একমাত্র বল। আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে বলেছেন: একতার রজ্জু শক্ত করে ধর। অতএব একতা ফরয। ভাষা লয়ে ঝগড়া করে আমরা সে ঐক্য নষ্ট করতে পারি না।

লীঃ সঃ: সেটা ঠিক। কিন্তু আল্লার ভাষা ত্যাগ করে একদল যদি উর্দু চান, আর এক দল যদি বাংলা চান, তবে মুসলমানের ঐক্য থাকে কি করে?

সেক্রেটারি: উর্দুর পতাকা-তলেই আমরা একতাবদ্ধ হতে পারি।

ডাঃ চ্যাঃ: বাংলার পতাকা-তলে নয় কেন?

লীঃ সঃ: আল্লার ভাষার পতাকা আরবী ছাড়া মুসলমানদের দ্বিতীয় পতাকা হতেই পারে না।

মন্ত্রী: সাহেবান, আপনারা আবার একতার নামে বিরোধের পথে চলেছেন।

লীঃ সঃ: কিন্তু উপায় কি? এ সমস্যার সমাধান কি?

পি. এস. বি.: আছে। এই সমস্যার একটি মাত্র সমাধান আছে।

সকলে: (চোখে-মুখে আগ্রহ লইয়া) কি, কি, কি?

পি এস. বি.: জনাব মন্ত্রী সাহেব অনুমতি দিলে হয়ত বলতে পারি।

মন্ত্রী: হাঁ, হাঁ, বলুন, অনুমতি দিলাম।

পি. এস. বি.: হুযুর, শুধু আপনার অনুমতি হইলেই চলবে না। ওলামায়েদীনের অনুমতি লাগবে। কারণ, ইসলামী শিক্ষার স্কীম করার হক শুধু তাঁরারই।

সকলে: ওলামায়েদিনের এতে কোনো আপত্তি হতে পারে না।

যে সমাধানে মুসলমানরার ঐক্য সংহতি অটুট থাকবে, তাতে আপত্তি করবেন ওলামায়েদিন? বলেন পি. এস. বি. সাহেব। লীগ্‌গির বলেন। আর দেরি সয় না।

পি. এস. বি.ঃ (কাসিয়া দেরি করিয়া শ্রোতারার আগ্রহ বাড়াইয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন) আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরাজী কিছুই আমরা শিখব না। কারণ, যে ভাষাই শিখি, কিছু লোক তার বিরোধী থাকবেই। মুসলমানরার মধ্যে আত্ম-কলহ আমরা জাগাতে পারি না।

সকলেঃ (অধৈর্য হইয়া) এসব কথা আমরা জানি। আপনি কোন্ ভাষার কথা বলতে চান, তাই বলে ফেলুন না। অত লম্বা ভনিতা করতেছেন কেন?

পি. এস: বি.ঃ বলতেছি সাহেবান, বলতেছি। আমি এমন একটি ভাষার কথা বলব, এমন একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করব, যেটা সকলেই বলতে পারে, সকলেই বুঝতে পারে।

সকলেঃ (ধৈর্যহারা হইয়া) হঁা হঁা, বুঝলাম। কিন্তু সেটা কোন্ ভাষা?

পি. এস. বি.ঃ সেই সার্বজনীন বিশ্ব-ভাষা, আদি ও অনন্ত ভাষা হইতেছে ইশারাঃ চোখ-ইশারা ও হাত-ইশারা। আমরা এই ইশারার ভাষায় কাজ চালাব। ফারসীতে একটা মূল্যবান কথা আছেঃ আকেল-মন্দরা ইশারা বস্ আস্ত্। বুদ্ধি-মানরার ইশারাতেই কাজ চলে। হাত চোখ ও মুখের ইশারায় আমরা কাম্‌স্কাট্‌কা হতে হনুলুলু পর্যন্ত সব দেশে কাজ চালায়ে আসতে পারি। প্রেম, ভালবাসা, ক্রোধ প্রভৃতি মানুষের সবচেয়ে বড় ও মহৎ বৃত্তি আমরা ইশারাতেই প্রকাশ করে থাকি। আর তুচ্ছ ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারব না? এমন কি, ইশারাতে আমরা যখন গরু-মহিষ ও ছাগল-কুকুরের সংগে কথা বলতে পারি, তখন মানুষের সাথে না পারার কোনও কারণ নাই। অথচ ইশারা কাফেরী ভাষা নয়। আরবেও ইশারায় কাজ হয়।

(পি. এস. বি. সাহেব হাত ও চোখ-মুখের বিভিন্ন ভংগি করিয়া ইশারার

এমন প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন করেন, যা সকলেই বুঝেন এবং প্রাণ খুলিয়া হাসেন। সে হাসিতে মন্ত্রী সাহেবও যোগ দেন।)

সকলে ঃ মারহাবা, মারহাবা। আমরা জনাব পিঃ এস. বি.র প্রস্তাব গ্রহণ করল্যাম। অতঃপর আমরা ইশারায় কাজ করব। ইশারা ভাষা ছাড়া আমরা কোনো ভাষা লিখে এবং শিখে অযথা সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট করব না।

ডি. পি. ই. ঃ কিন্তু আমরা নাম দস্তখত করব কিরূপে?

পি. এস. বি. ঃ কোন ভাবনা নাই। যতদিন আল্লার-দেওয়া এই বুড়া আংগুল বেঁচে আছে, ততদিন আমরার কোনো কাজ ঠেকে থাকবে না। ইংরেজ আমলে পরাধীন দেশেই আমরার দাদা-পর দাদারা টিপসই দিয়ে মহাজনরার নিকট হতে হাজার-হাজার টাকা ঋণ করতে পারছিলেন ঃ আর আজ আমরা স্বাধীন হয়েও টিপসই দিয়ে কাজ চালাতে পারব না? তবে স্বাধীন হওয়ার সার্থকতা কি?

প্রিন্সিপাল ঃ কথাটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আরেক দিক থেকেও এ প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য। দস্তখতের চেয়ে টিপসই যে অধিকতর মূল্যবান, তার প্রমাণ এই যে দলিল রেজিষ্ট্রির বেলায় দস্তখত-জানা লোকেরও টিপসই দিতে হয়। কাজেই এ প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আমার শুধু জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখাপড়াটা কি তবে একদম বন্ধ হয়ে যাবে? কলেজ-টলেজ কি সব উঠে যাবে?

আলিম ঃ আপনারা ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক হতে, চাকুরি থাকা-না-থাকার দিক থেকে, প্রশ্নটার বিচার করবেন না। শুধু ইসলামের স্বার্থের দিক হতে বিচার করবেন। পি. এস. বি. সাহেবের স্কীমে শুধু লেখাই বন্ধ হবে, পড়া ত বন্ধ হবে না। লেখা ও পড়া দু'টা আলাদা জিনিস, এক জিনিস নয়। পড়াই আমরার পক্ষে ফরয, লেখা ফরয নয়। বলকে, লেখাটা ফযুল—অনাবশ্যক।

ভাঃ চ্যাঃ ঃ না লিখেও আবার পড়াশোনা হয় নাকি?

ফাযিল ঃ হবে না কেন? এই সাধারণ কথাটা বুঝলেন না, ভাইস-

চ্যান্সেলর সাহেব ? হাদিস-কোরআন ত ছাপাই পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা ছাপা কোরআন-হাদিস পড়বে, লেখার দরকার কি ? আপনারা কি নিজেরাই কোরআন-হাদিস লিখ্তে চান না কি ?

ভাঃ চ্যাঃ : (বিষণ্ণ মুখে) যে যাই বলেন, এ স্কীমের পরিণামে এদেশে লেখাপড়াটা বন্ধ হয়ে যাবে।

আলিম : কিন্তু পড়াশোনাটা বন্ধ হবে না।

মন্ত্রী : ওতে যদি লেখাপড়া বন্ধ হয়েই যায়, তবে তা হোক, শুধু পড়াশোনা থাকলেই হল। এটা ত অস্বীকার করার উপায় নাই যে, লেখাপড়া শিখে আমরার ছেলেমেয়েরা দিন-দিন ধর্মহীন, এমনকি কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে। কমিউনিযমের হাত হতে দেশকে রক্ষা করতে হলেও লেখাপড়া একদম বন্ধ করতেই হবে।

ফাযিল : তাছাড়া লেখা শিখে আমরার ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা, বেগানার সাথে প্রেম-পত্র লেখতেছে। এটা বন্ধ না করতে পারলে সমাজ জাহান্নামে যাবে।

এম. এল. এ. : লেখাপড়া না শিখ্লে আমরা ইলেকশন চালাব কেমন করে ?

মন্ত্রী : সেজন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। নিবেদন ইশ্তাহার ও বিজ্ঞাপনে কত টাকা খরচ হয়ে যায়। এ টাকা থেকে ত বেঁচে গেলাম, সেটা দেখবেন না। এর পর শুধু ভোটের মিটিং করব, মিটিং-এ বক্তৃতা করব, আর ভোটাররা ? তারা ত সিম্বল দেখেই বাক্সে ভোট দিবে। সেখানে লেখাপড়ার দরকারটা কোথায় ?

ভাঃ চ্যাঃ : তা হলে দেখা যাচ্ছে, এ কমিটির নাম শিক্ষা-সংস্কার কমিটি না হয়ে শিক্ষা-সংহার কমিটি হওয়া উচিত ছিল। আমরা শিক্ষাকে সংহারই করতে যাচ্ছি।

মন্ত্রী : (ধমক দিয়ে) এটা আপনি কোন্ দেশী রসিকতা করলেন ? কেন এতে শিক্ষার সংহার হবে ? শুধু লেখাপড়ারই সংহার হবে। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব, আমি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, আপনি এড্যুকেশন ও

লিটারেসির পার্থক্য বুঝেন না। আমি এডুকেশন মিনিস্টার, লিটারেসি মিনিস্টার নই।

ডি. পি. ই.: তা হলে মুদ্দা কথা দাঁড়াল এই যে, পাকিস্তানে স্কুল-কলেজ থাকবে না।

মন্ত্রী: স্কুল কলেজ একেবারে থাকবে না, তা নয়। তবে আবশ্যকের অতিরিক্ত থাকবে না। এতে দেশবাসীকে শুধু যে কুশিক্ষার হাত হতেই বাঁচান হবে, তা নয়। এক বিপুল অপব্যয়ের হাত হতেও রাজকোষ বেঁচে যাবে। রাজকোষের এই অপব্যয় কমলে বহু টাকা উদ্বৃত্ত হবে। সেই উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা আপনেরার সকলের বেতন-ভাতা স্বচ্ছন্দে বাড়ায়ে দেওয়া যাবে।

প্রিন্সিপাল: স্কুল-কলেজ না থাকলে আমরারে মাইনা দিবেন কেন স্যার?

মন্ত্রী: আমরা মন্ত্রীরা ত কাজ-কর্ম না করেই মাইনা নিতেছি। আপনেরারে দিব না কেন?

প্রিন্সিপাল: মন্ত্রীরার কথা সার আলাদা। আমরার কিছু একটা কাজ ত দেখাতে হবে? কিন্তু আমরা মাইনা নিয়া কাজটা কি করব? একটা মাসকাবারী রিপোর্ট ত দিতে হবে?

মন্ত্রী: কাজ করবার থাকবে ঢের। বরঞ্চ কাজ আপনেরার আরও বাড়বে।

ডি. পি. ই.: সেটা কেমন স্যার? স্কুল-কলেজ উঠে যাবে। আর আমরার কাজ বেড়ে যাবে। এ কথাটা ত বুঝতে পারলাম না, স্যার?

মন্ত্রী: বুঝবেন, ক্রমে বুঝবেন। এখন দালানের কামরায় টেবিল-চেয়ারে বসে বিশ-পঞ্চাশটা ছেলেকে লেখা-পড়া করার উপকারিতা বুঝান, আর ভবিষ্যতে গ্রামে-গ্রামে সভা করে বিশ-পঞ্চাশ হাজার শ্রোতাকে লেখা-পড়া না করার উপকারিতা বুঝাতে হবে। খাটনিও হবে বেশী। বেতন-ভাতাও পাবেন বেশী।

সকলে: তবে নতুন স্কীমে আমরার কোন আপত্তি নেই।

(অতঃপর বিনা সংশোধনে সর্ব-সম্মতিক্রমে শিক্ষা-সংস্কার স্কীম গৃহীত হইল। আইন-পরিষদে এই স্কীম উপস্থিত করিলে কে না-কে গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয় এবং তাতে শুভ কাজে অনর্থক বিলম্ব ঘটিয়া যায়, সেজন্য স্থির হইল, অনতিবিলম্বে লাট সাহেবকে দিয়া একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া অতিসত্বর এই সংস্কার প্রবর্তিত হইবে।

মন্ত্রী সাহেব আরেক টিন বিদায়ী সিগারেট বিতরণ করিলেন। প্রায় সকলেই একাধিক সিগারেট হাতে লইলেন। সকালে সকলকে মোবারকবাদ দিয়া যথাসম্ভব মুসাফিহা করিয়া 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলিতে-বলিতে বিদায় হইলেন।)

চতুর্থ দৃশ্য

(কারকেন বাড়ী লেনে মুসলীম লীগ অফিসে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। মেম্বরগণ ছাড়াও বিশেষভাবে-নিমন্ত্রিত কয়েকজন নেতা ও আলিম সভায় উপস্থিত। মন্ত্রীগণ পদাধিকার বলে সকলেই ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বর। সুতরাং তাঁরাও উপস্থিত। অধিকাংশ সদস্যের মুখেই বিরক্তি ও নৈরাশ্য পরিস্ফুট। মুসলীম লীগ সভাপতিই সর্বপ্রথম কথা বলিলেন।)

লীঃ সঃ ঃ পাকিস্তানী তহজিব ও তমদ্দুনের খাতিরে আমরা শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার করেছি। সে সংস্কার সকল দিক দিয়াই খুব সফল হয়েছে। শরিয়ত বিরোধী নাস্তিকতাবাদী বিজ্ঞান-দর্শনের আফত-বালাই পাকিস্তান হতে একরূপ বিতাড়িত হয়েছে। স্কুল-কলেজগুলি এখন শুধু ইশারার মক্তব-মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। তরুণদারে শুধু ইশারা শিখান হচ্ছে। আর তারার মুখের আওয়াযের মধ্যে মক্তব-মাদ্রাসায় এখন শয়তানি নামতা ও আবৃত্তি শিক্ষার বদলে সকাল-সন্ধ্যায় শুধু সুমধুর মিসরী ইলহানে কেরাত উচ্চারণ হচ্ছে। লেখার চর্চা একদম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কলম-দোওয়াত সব ভেংগে ফেলা হয়েছে। পেপার মিল আগুনে পোড়ায়ে ছাই করা হয়েছে। কাগজ আমদানী

বেআইনী করা হইছে। যে সব ল্যাবরেটরিতে খোদার উপর খোদকারি শিক্ষা দেওয়ার তুকাব্বরি করা হত, খোদার কুদরতে সেখানে আজ বাদুর ঝুলতেছে (সকলের হাস্য)। কিন্তু ভাই সাহেবান, দুঃখের সহিত জানতে পেরেছি যে, আইন-কর্তারাই আইন ভংগ করতেছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, মন্ত্রী পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং বড় বড় সরকারি কর্মচারির ছেলেরা নয়া নিসাবের মকতব-মাদ্রাসায় পড়তেছে না। তারা নাসারার কারিকুলাম মতই এখনও লেখা ও পড়া দুটাই চালায়ে যাচ্ছে। মফস্বলের শাখা লীগসমূহ হতেও আমি রিপোর্ট পাচ্ছি যে, সেখানেও এ একই অবস্থা। সেখানকার বড় বড় সরকারী কর্মচারি এবং স্থানীয় নেতারা নয়া নিসাবের মকতব-মাদ্রাসায় ছেলে দেন না। তার বদলে মন্ত্রী সাহেবান এবং সরকারী কর্মচারিরা তাঁরার ছেলে-পিলেকে, এমন কি মেয়েরারেও, করাচী পাঠায়ে খৃস্টানী শিক্ষা দিচ্ছেন। দলে-দলে ছেলে-মেয়েরারে করাচী পাঠাবার জন্য চাটগাঁ বন্দরে কয়েকটি জাহাজ নাকি চার্টার করা হয়েছে। এতে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে সম্বন্ধে জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগের কর্তব্য নির্ধারণের জন্যই আমি আজ ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠক ডেকেছি। আমি প্রথমে মাননীয় মন্ত্রীরার বক্তব্য জানতে চাই। আশাকরি তাঁরা নিজেরার কাজের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিবেন।

প্রধান মন্ত্রী: জনাব সভাপতি ও সাহেবান, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীই নয়া শিক্ষা স্কীম করেছেন, তিনিই আমার পক্ষ হতে মন্ত্রীরার কৈফিয়ৎ দিবেন।

শিক্ষা মন্ত্রী: আমার নেতা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী সাহেবের হুকুম তামিল করবার জন্যই আমি দাঁড়ালাম, অন্যথায় মন্ত্রীরার তরফ হতে কথা বলবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। ভাই সাহেবান, আপনারা সকলেই অবগত আছেন, পাকিস্তান হতে নাসারী-নাস্তিক কুশিক্ষা দূর করবার জন্য আমরার মধ্যে ইসলামী তহযিব ও তমদ্দুন প্রচলনের জন্য এই খাকসার বান্দাই সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করেছে। তথাপি আমার

নিজের পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনিরারে নিজের দেশে অল্প খরচে ইসলামী শিক্ষা না দিয়ে বেশী খরচে খৃস্টানী শিক্ষা দেবার জন্য করাচীর মত দূর দেশে পাঠালাম কেন, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই আপনেরার মনে উদিত হয়েছে। আপনেরা অনেকে হয়ত গোস্বাও হয়েছেন। কিন্তু আসল কথা যদি আপনারা জানতে পারেন, তবে আমার ও আমার মত অন্যান্যের প্রতি আপনারা গোস্বা না হয়ে বরঞ্চ আমরারে ধন্যবাদ দিবেন।

(সকলের চোখ-মুখে বিস্ময় ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁরা বক-গ্রীব হইয়া মন্ত্রী সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মন্ত্রী সাহেব বলিতে লাগিলেন।)

মন্ত্রী ঃ ভাই সাহেবান, ইসলামী শিক্ষা হাসিল করা একদিকে যেমন প্রত্যেক পাকিস্তানীর কর্তব্য, তেমনি এটা তাঁরার জন্মগত অধিকার। তাছাড়া ওটা সওয়াবের কাজও বটে। আমরা যেদিন থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে খৃস্টানী শিক্ষা উঠায়ে দিয়ে ইসলামী শিক্ষার প্রবর্তন করেছি, সেদিন থেকে মুক্তি-পাওয়া কারাবন্দীর মত দেশবাসী ইসলামী শিক্ষায়-তনের দরজায় ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে। কে আগে আল্লার ধর্ম শিক্ষা করে ইহ-পরকালের পুঁজি হাসেল করবে, কে কার আগে জান্না-তুল ফেরদৌসের কত কামরা রিযার্ভ করবে, তার জন্য তারার মধ্যে হুড়াহুড়ি লেগে গেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। মুসলমান ধর্ম-প্রাণ জাতি। ধর্ম শিক্ষার জন্য তারার এই ব্যাকুলতা যেমন গৌরবের বিষয় তেমনি স্বাভাবিক। কিন্তু ভাই সাহেবান, খৃস্টান ইংরেজরার হঠাৎ ফেলে-যাওয়া এই খৃস্টানী শাসনযন্ত্রকে আমরা রাতারাতি ইসলামী শাসনযন্ত্রে পরিণত করতে পারি না ত। দেশের ছেলে-পেলেরা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শাসনযন্ত্রের ভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত শাসনযন্ত্র চালায়ে যেতে হবে না ? কি বলেন আপনারা ?

অধিকাংশে ঃ (সমস্বরে) জি, হঁা। চালায়ে যেতে হবে বই কি ?

শিঃ মঃ ঃ (খুশী হইয়া) তা যদি হয়, ভাই সাহেবান, তবে এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে রাষ্ট্রের কার্য চালায়ে যাবার জন্য একদল কর্মচারির

দরকার হবে না ?

অধিকাংশে ঃ (সমস্বরে) জি, হাঁ, তা ত হবেই ?

শিঃ মঃ ঃ (গম্ভীরভাবে) এই সব কর্মচারিকে বর্তমানের মতই খৃস্টানী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া দরকার, এটা ঠিক কি না ?

অধিকাংশে ঃ জি হঁা, তাই ত মনে হয়।

শিঃ মঃ ঃ (গলায় যথেষ্ট দরদ আনিয়া) এ সব হতভাগ্য শিক্ষার্থীকে ইসলামী শিক্ষা হতে বঞ্চিত থাকতে হবে, সেজন্য তারার গোনাহ্‌গার হতে হবে, পরকালে বেহেশত থেকে মাহরুম থাকতে হবে। এটা আপনারা বুঝতে পারতেছেন ত ?

অধিকাংশে ঃ জি, হা, এটা ত স্পষ্টই বুঝা যায়।

শিঃ মঃ ঃ ফলে যারা খৃস্টানী শিক্ষা গ্রহণ করতে যাবে, তারা শুধু রাষ্ট্রের সেবার উদ্দেশ্যেই নিশ্চিত দুযখে যাওয়ার এই ঝুঁকি মাথায় নিয়েই তা করতে যাবে। সুতরাং এটা দেশের জন্য প্রাণ দিতে যুদ্ধে যাওয়ার মতই একটা বিরাট ত্যাগের ব্যাপার। কেমন ত ?

অধিকাংশে ঃ নিশ্চয় তাতে আর সন্দেহ কি ?

শিঃ মঃ ঃ এই ত্যাগের কাজে, রাষ্ট্রের সেবায় এই কোরবানির কাজে, দেশবাসী সকলের ছেলেরারে আমরা জোর করতে পারি না, কারণ, এটা ধর্মীয় ব্যাপার এবং ধর্মের ব্যাপারে যবরদস্তি চলে না। কি বলেন আপনারা, পারি আমরা জোর-যবরদস্তি করতে ?

অধিকাংশে ঃ জি, না, তা ত পারেন না।

শিঃ মঃ ঃ (সগৌরবে) সেজন্য আমরার মাননীয় লিডার প্রধানমন্ত্রী সাহেবের উপদেশে আমরা কেবিনেট মিটিং-এ স্থির করেছি, সবার আগে আমরা নিজেরাই দেশের সেবায় নিজেরার পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনিদেরে কোরবানি করব। আমরার পবিত্র ধর্ম ইসলাম হযরত ইবরাহিমের মারফৎ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। ইসলাম বলে, দেশের জন্য যদি কোরবানি করতে হয়, তবে-নেতারার উচিত সকলের আগে নিজেরার ছেলেমেয়েরারে কোরবানি করা। কারণ 'সৈয়দুলকওমে খাদেমুহু'।

নেতারা জাতির খাদেম মাত্র। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের সত্যিকার ইসলামী নেতা অর্থাৎ খাদেম হিসাবে আমরা মন্ত্রীরা এ ত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করেছি এবং সরকারী কর্মচারীয়ারেও এ ত্যাগ স্বীকারের জন্য অনুরোধ করেছি।

সকলে ঃ মারহাবা, মারহাবা।

শিঃ মঃ ঃ আপনারা শুনে আরো তাজ্জব হবেন যে, আমরা আমরার ছেলেমেয়েরারে এভাবে কোরবানি দেবার আগে তারারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ পাকিস্তানের সেবায় প্রয়োজন হলে তোমরা দুযখ যেতে রাজী আছ? আপনারা শুনে খুশী হবেন যে, তারা সকলে একবাক্যে বলেছে ঃ "পাকিস্তানের খেদমতে আমরা জাহান্নামে যেতেও প্রস্তুত আছি।"

সকলে ঃ (অধিকতর জোরে) মারহাবা, মারহাবা। আপনারার ছেলেমেয়ে যিন্দাবাদ।

লীগ সেক্রেটারি ঃ পাকিস্তানের সেবায় জনসাধারণও যদি তারার ছেলেমেয়েরারে আপনেরার মতই কোরবানি দিতে চায় তবে কি হবে?

শিঃ মঃ ঃ আমরা জানি, পাকিস্তানী মাত্রেই আমরারই মত দেশ-প্রেমিক। পাকিস্তানের সেবার জন্য তারাও নিজ-নিজ পুত্র-কন্যারে কোরবানি করতে চাইবে, এ আশংকাও আমরার আছে। কিন্তু ইসলামী নেতা হিসাবে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নায়ক হিসাবে আমরা জনসাধারণকে এ আত্মহত্যামূলক সাংঘাতিক ত্যাগ করে পাপ করতে দিতে পারি না। সে জন্য এ ত্যাগকে, খৃস্টানী কুফরী শিক্ষাকে, আমরা বিপুল ব্যয়-সাধ্য করে গরিব জনসাধারণের নাগালের বাইরে একেবারে করাচীতে নিয়া ফেলেছি—যেমন করে আমরা মদের উপর ভারী ট্যাকস বসায়ে মদ্যপানকে গরিবের নাগালের বাইরে নিয়া থাকি। এই উদ্দেশ্যে কুফরী শিক্ষার ব্যবস্থা একমাত্র রাজধানী করাচীতেই সীমাবদ্ধ করেছি। জন-সাধারণ ইচ্ছা করলেও এখন পতংগের মত ঐ ত্যাগের আগুনে ঝাপ দিতে পারবে না। কাশমীরফ্রন্টে এবং অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে জান কোর-বানির যে-সব ত্যাগে গোনাহ নাই, বরঞ্চ সওয়াব আছে, সেই সব

ত্যাগের ক্ষেত্র আমরা জনসাধারণের জন্য রিযার্ভ রেখেছি। ভাল করেছি, কি মন্দ করেছি? কি বলেন আপনারা?

সকলে: মারহাবা, মারহাবা। ঠিক কাজই করেছেন। মুসলমান নেতার উপযুক্ত কাজই করেছেন।

(অতঃপর পাকিস্তানের সেবায় মন্ত্রী, পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি, সরকারী কর্মচারি ও কতিপয় নেতা ও ব্যবসায়ী যেভাবে স্বেচ্ছাকৃত বিপুল কোরবানি করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁরাকে জাতির পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া এবং রহমানুর রহিম আল্লার দরগায় তাঁরার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে স্বয়ং সভাপতি সাহেবের প্রস্তাবে এক তযবিয বিপুল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে গৃহীত হইল।

সভা শেষে প্রধান-মন্ত্রীর বাড়িতে ডিনার হইল এবং ডিনারের পরে সমস্ত মেম্বরকে গুলিস্তান পিকচার হাউসে 'নাগিনা, বায়স্কোপ দেখান হইল)

(ড্রপসিন)

মে, ১৯৫২

বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে

১

মিষানের বাসায় বসে বন্ধুরা আড্ডা দিচ্ছিলাম এবং তার চা ও তামাক ধ্বংস করছিলাম।

হেনকালে বন্ধু মাহমুদ এসে হাযির।

আমরা সবাই মাহমুদকে দেখে তাজ্জব। কারণ আড্ডা দিবার লোক সে নয়। বিনা কাজে সে বড় একটা কোথাও যায় না।

সবাই সমস্বরে বলে উঠলাম: এসো এসো। কিসের জন্য আমরার এ সৌভাগ্য?

মাহমুদ গম্ভীর মুখে বলল: ঠাট্টা তোমরা করতে পার ভাই; কিন্তু সত্যই আমি বড় বিপদে পড়েই তোমরার কাছে এসেছি। আমি জানতাম, এখানে এলে তোমরার সবাইকে এক সংগে পাব।

আমরা সবাই চিন্তিত হলাম। বেচারা ভাল মানুষ, মাহমুদ তবে সত্যই কোনো বিপদে পড়েছে?

সকলে উৎসুক চোখে মাহমুদের দিকে চেয়ে রইলাম।

কথা বলল মিষান। সে গলায় যথেষ্ট দরদ এনে বলল: বল ভাই মাহমুদ, তুমি কি অমন বিপদে পড়েছ?

মাহমুদের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে ঢোক গিলে বলল: আমি যে আর ঘরে টিকতে পারছি না ভাই, কি করি এখন?

বিবির সংগে মাহমুদের ঝগড়া হয়েছে? অবস্থা এমনি চরমে উঠেছে যে, সে ঘরে টিকতে পারছে না? তবে ত খুবই চিন্তার কথা। কিন্তু ঐ জটিল ব্যাপারে আমরা কি কাজে লাগতে পারি? তাই কেউ কোনো কথা না বলে মাহমুদের জন্য সবাই গভীর ব্যথা অনুভব করতে

লাগলাম। আমরার আনন্দের হট্ট-মন্দির জানাযার জমাতের মত গম্ভীর হয়ে উঠল।

ওদুদ ছিল আমরার মধ্যে সব চেয়ে মুখ চতুর। সে আমরার খুম্সাম ভাব পসন্দ করল না। তাই সে বলল: ভাবী-সাব শাড়ি চাইছিলেন বুঝি? তা, অত টাকা রোজগার করছ, দাও না ভাবীকে একখানা জংলী শাড়ি কিনে। দেখবে, ঘরে টিকতে পারবে না শুধু, ঘর থেকে বের হতেই পারবে না।

মাহমুদ অপ্রস্তুত হয়ে বলল: তোমরার ভাবীর কথা বলতেছি না। সে বেচারীর শাড়ি ধরে টানাটানি করতেছ কেন?

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

ওদুদ বলল: আমরা এমন পাশব কৌরব আজো হই নাই যে, ভাবী-দ্রৌপদির বস্ত্র হরণের চেষ্টা করব।

মাহমুদ বুঝল নিজের অজ্ঞাতে সে বেকায়দার রসিকতা করে ফেলেছে। সে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল: না, না, তোমরা ভুল বুঝেছ। তোমরার ভাবীর সংগে আমার কোনো ঝগড়া হয় নি।

মাহমুদ কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করতেছে দেখে আমরা কেউ কেউ বললাম: কে তবে তোমারে ঘরে টিকতে দিচ্ছে না?

এবার মাহমুদকে বেকায়দায় ফেলা হয়েছে। অতএব, তার জবাব শুনার জন্য সবাই আগ্রহে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

সে আন্তরিকতার সাথে ধীরে-ধীরে প্রতিকথায় জোর দিয়ে বলল: বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-পড়শির জ্বালায় সত্যই আর ঘরে থাকতে পারতেছি না।

এ আবার কি কথা? ভাবীকে বাঁচাবার চেষ্টায় পাড়া-পড়শির ওপর নাহক এলযাম লাগান? এ আমরা কিছুতেই হতে দিব না। মাহমুদ কিছুতেই আর তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারবে না নিশ্চিত জেনেই আমরা সমস্বরে বললাম: বন্ধু-বান্ধব আর পাড়া-পড়শিরা ভাবী সাবকে কিছু বলেছে নাকি? কে তারা? আমরা তারারে আর আস্ত রাখব না। তুমি খালি তারার নাম কও একবার।

দাও দেখি চাঁদ এ কথার জবাব। আমরা চ্যালেঞ্জের ভংগিতে মাহমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মাহমুদ বলল: না, না, তারা তোমার ভাবীরে কিছু কয় নাই। তারা সবাই ধরেছে এবার কর্পোরেশন ইলেক্‌শনে আমার দাঁড়াতে হবে।

আমরার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

আমরা কেউ-কেউ একেবারে নিরাশও হলাম।

মাহমুদ আমরার ভাব-বিপর্যয় লক্ষ্য না করে বলে যেতে লাগল: আমি কত বললাম ও-কাজ আমারে দিয়ে হবে না। কিন্তু, কেউ আমার কোন কথা শুনছে না। দিনরাত তাগাদা করে আমারে অস্থির করে তুলেছে। ঘরে টেকা দায় হয়ে উঠেছে।

আমরা জানতাম, পাড়া-পড়শির সংগে মাহমুদ খুব বেশী মেলা-মেশা করত না। এটাও আমরা জানতাম যে, হাযিরানে মজলিসের এই কয়জন ছাড়া মাহমুদের আর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। তবু হঠাৎ কারা মাহমুদের এতবড় হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব দাঁড়ায়ে গেল, পাড়া-পড়শিরাই বা হঠাৎ মাহমুদের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এতটা ব্যগ্র হয়ে কেন উঠল, এসব রহস্যের কোন মর্মই আমরা উদঘাটন করতে পারলাম না।

তবু ভাবী সাবের সংগে মাহমুদের ঝগড়া হয়নি জেনে আমরা সবাই আন্তরিক খুশী হলাম। কারণ মাহমুদের সংগে আর যাই হোক আমরার কারো শত্রুতা ছিল না।

আমরার আডডার স্বাভাবিক উত্তাপ ফিরে আসল। আমরার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইতে লাগল। অনেকেই সিগারেট বার করলাম। কেউ-কেউ পানের ফরমাশ দিল। মিযান চাকরকে তামাকের হুকুম দিল।

মাহমুদ: "তামাক এখন থাক, তোমরা সিগারেট খাও" বলে পকেট থেকে সিগারেটের আস্ত একটা টিন বার করে টেবিলের ওপর রাখল। আমরা মাহমুদের বদান্যতায় মুগ্ধ হলাম। বিস্মিত হলাম

৪—

তার চেয়ে বেশী। কারণ এ কাজ সে বড় একটা করত না। তার ওপর যুদ্ধের মওসুমে মাংগা দামের সিগারেট।

অতএব, আমরা অনেকেই নিজেরার বার করা সিগারেট বায়ান্তরে খাব স্থির করে পুনরায় যার-তার পকেটে পুরলাম এবং মাহমুদের টিন থেকে এক-একটা সিগারেট বার করে নিলাম।

মাহমুদ পকেট থেকে দেয়াশলাই বার করে সবাইকে সিগারেট ধরায়ে দিতে দিতে বলল: এ অবস্থায় তোমরা আমাকে কি পরাম দাও? তোমরাই আমার একমাত্র হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব। আপনার বলতে এই কোলকাতার শহরে আমার আছ কেবল তোমরাই। তোমরার পরামর্শ ছাড়া আমি কোনকালে কিছু করিও নাই, ভবিষ্যতে কিছু করবও না।

আমরা সবাই নিজ-নিজ বিস্মৃত স্মৃতির সব ঘর-দরজার অন্ধকার আনাচে-কানচে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু মাহমুদ কবে কোন্ কোন্ কাজে আমাদের পরামর্শ চেয়েছে, আমরার পরামর্শে কোন্ কোন্ কাজে কবে-কবে বিরত হয়েছে, তার কোনও নযির পাওয়া গেল না।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কিন্তু কেউই মাহমুদের কথার প্রতিবাদ করল না। কারণ ভদ্রতার প্রতিবাদ করা অভদ্রতা।

আমরার মজলিসের অধিকাংশেরই অবসর প্রচুর, নিজেদের কাজ-কর্ম অপ্রচুর। কাজেই পরের ভাল-মন্দ ও লাভ-লোকসানের আলোচনাতেই আমরা বেশী সময় ব্যয় করি এবং অযাচিত সদুপদেশ দান করে থাকি। তার ওপর মাহমুদ এসেছে আমরার উপদেশ চাইতে। এ অবস্থায় আমরা সবাই যেচে তারে যথাসাধ্য সদুপদেশ দেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। সেজন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিপদ, খরচ-খরচার বাহুল্য ইত্যাদি বিষয়ে সকল দিক বিবেচনা করে আমরা তাকে অমন ঝুঁকি ঘাড়ে না নিবার হিতোপদেশই দিতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু মাহমুদ আমরার হুকুম ছাড়া কিছু করবে না শুনে আমরা খুবই দ্বিধায় পড়ে গেলাম। একদিকে খরচ-খরচার ভয়ে 'হাঁ'ও বলতে পারলাম না; অপর দিকে আবার নিরুৎসাহ দিলে মাহমুদ মনে কষ্ট

পাবে ভয়ে তারে 'না'ও বলতে পারলাম না। তবে কেউ কেউ খুব সাবধানে যুদ্ধের বাজারের কাগয-পেটলাদির দুর্মূল্যতার কথা, বিশেষতঃ, মাহমুদের কারবারের সাম্প্রতিক লোকসানের কথা. তুলে ফেলল।

কিন্তু সে কথা তুলতে-না-তুলতেই মাহমুদ বলল: খরচের জন্য তোমরা ভেবো না; বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-পড়শিরা বলছে আমার কিছু খরচ করতে হবে না; তারা নিজেরার ঘরে খেয়েই ভোটাররূপী বনের মইষ তাড়া করবে।

এ কথার পর আমরা খুশী না হয়ে পারলাম না। খরচের ভাবনা সত্যিই আমরার আর থাকল না।

অতএব আমরা বললাম: তবে কিনা মুসলীম লীগের নমিনেশন যদি না পাও, তবে তোমার ইলেকশনে জিতবার চান্স খুব কম। সেটা পাবার যদি ভরসা থাকে. তবে তুমি বিসমিল্লাহ্ বলে দাঁড়ায়ে পড়।

মাহমুদ দাঁত বার করে বলল: সেইটাই ত হয়েছে আমার আরো মুশকিল। বন্ধু-বান্ধব পাড়া-পড়শির অনুরোধ বরঞ্চ এড়াতে পারতাম, কিন্তু লীগ-অফিস থেকে যেভাবে আমারে দাঁড়াবার লাগি তাগিদ দিছে, সেটা ত আর ফেল্‌তে পারতেছি না।

আমরা সবাই পরম উৎসাহে বললাম: লীগ অফিস থেকে তোমারে অনুরোধ করেছে দাঁড়াবার লাগি, বল কি হে?

মাহমুদ: তবে আর বলতেছি কি? শহীদ সাব দিনে তিনবার করে লোক পাঠাচ্ছেন। তাই ভাবছি দাঁড়াব কি না? এখন শুধু তোমরার পরামর্শের অপেক্ষা। তোমরার হুকুম না পেলে ত হে-হে-হে—

আমরা সমস্বরে বললাম: আর এক মিনিট দেরী করো না ভাই। এই মুহূর্তে নমিনেশন পেপার ফাইল করে এসো।

মাহমুদ সিগারেটের টিন খুলে আরো কটা করে সিগারেট বিলায়ে টিনটা পকেটে তুলে বলল: তাহলে তোমরার সাহায্য পেতে পারি?

আমরা: নিশ্চয় নিশ্চয়।

মাহমুদ: তোমরা তাহলে ওয়াদা করলা?

আমরা ঃ একশো বার।

মাহমুদ এক-এক জন করে সবাইকে আদাব দিয়ে হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করল।

২

পরদিন মুসলীম লীগের মুখপত্র, 'বঙ্গ ও আসামের একমাত্র দৈনিক' খবরের কাগযে খবর বার হল ঃ বন্ধু-বান্ধবের সনির্বন্ধ অনুরোধে মিঃ মাহমুদ সাত নম্বর ওয়ার্ড থেকে কর্পোরেশন ইলেকশনে দাঁড়াতে সম্মত হয়েছেন।

মাহমুদকে ওভাবে উৎসাহ দিয়ে ইলেকশনে দাড় করায়ে দিয়ে আর যেই নিশ্চিন্ত থাক, আমি থাকতে পারলাম না। বেচারা সোজা শান্ত মানুষ। লীগ নেতারাও লোক সুবিধার নয়। তাঁরা যদি মাহমুদকে ওভাবে লেলায়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নমিনেশনটা না দেন, ভোটাররা ভরশা দিয়ে বেচারাকে গাছে চড়ায়ে যদি শেষটায় মই কেড়ে নেয়, তবে বন্ধুটি আমার ভারী বিপদে পড়বে। এ সব কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হলাম এবং বিনা ডাকেই বন্ধুর বাড়ি গিয়ে হাযির হলাম।

গিয়ে দেখলাম অবাক কাণ্ড। মাহমুদের বাড়ির সামনে ছেলেরার ভিড়। খানকতক ট্যাক্সি ও অনেকগুলা ঘোড়ার গাড়ি তার বাড়ির সামনের রাস্তা জাম্ করে দাঁড়ায়ে। ব্যাপার কি?

ভিড় ঠেলে অতি কষ্টে মাহমুদের গেটে ঢুকে পড়লাম।

দেখলাম, মাহমুদ ঐ সব অপগণ্ড শিশুরার হাতে এক একটি করে টাকা ও এক-একটি কাগযের নিশান দিচ্ছে আর বলছে ঃ টাকাটা পকেটে পুরে নিশানটি হাতে নিয়ে ঐ সব গাড়িতে চড়ে তোমরা রাস্তায় রাস্তায় মুসলিম লীগ যিন্দাবাদ ও 'মাহমুদ সাব কো ভোট দো' চীৎকার করে বেড়াবে। আর কিছু বলবে না ঃ আর কারও নামে যিন্দাবাদ দিতে পারবে না বুঝলে? আমার লোকজন তোমরার পিছনে-পিছনে থাকবে এবং

তোমরার কাজ তদারক করবে। যার গলার আওয়াজ যত মোটা হবে, সে তত মোটা বখ্‌শিশ পাবে ঃ সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে তোমরা এখানে খেয়ে-দেয়ে এবং বখ্‌শিশ নিয়ে বাড়ি যাবে। ফের কালও এমনি পাবে। ইলেকশন শেষ না হওয়াতক রোজই এমনি বখশিশ পাবে। এখন তোমরা যাও।

ছেলেরা ট্যাক্সি ও গাড়ির দিকে ছুটল। আমি আত্মরক্ষার জন্য পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। ছেলেরা হুরমুড় ও ছুটাছুটি করে গাড়ি বোঝাই হল। যারা গাড়িতে জায়গা পেল না, তারা গাড়ির ছাদে উঠে বসল। যারা তাও পেল না, তারা গাড়ির পাদানে ও পেছনে দাঁড়াল। সেখানেও যারার জায়গা হল না, তারা মিলিটারী কায়দায় কাতার করে দাঁড়াল। কনট্রোল ও রেশনের দওলতে ছেলেরা কিউ করে দাঁড়াবার অভ্যাস রফ্‌ত করেছে কি না।

মাহমুদের ইশারায় তার চাকর বাড়ির ভেতর থেকে চার-পাঁচটা 'মেগাফোন' এনে ছেলেরার মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক চার-পাঁচ জনের হাতে দিল। সবার আগে ছিল ট্যাক্সি। তাতে ছেলেরার ভিড়ের মধ্যে একজন ছিল দাঁড়ায়ে। তার মুখে ছিল একটা হুইসেল।

সে হুইসেলে ফুক দিল। মিছিল চল্‌ল। মহল্লা মাথায় তুলে ধ্বনি উঠল ঃ মুসলীগ লীগ যিন্দাবাদ, মাহমুদ সাবকো ভোট দো।

মিছিল আগাতে লাগল। ধ্বনি উঠতে থাকল। রাস্তার মোড়ে গিয়ে মিছিল অদৃশ্য হল।

তবু আমি সেদিক থেকে নযর ফেরাতে পারলাম না। কারণ দিগন্ত থেকে তখনও আকাশ-ফাটা ধ্বনি আসছিল ঃ মুসলিম লীগ যিন্দাবাদ, মাহমুদ সাবকো ভোট দো।

তুমি এখানে দাড়িয়ে কেন ভাই? কখন এলে?

আমার চমক ভাংলো মাহমুদের ডাকে।

সে আমার কাঁধে থাপ্পর মেরে বল্‌ল ঃ 'এসো ভাই ভেতরে এসো।'

ভেতরে গেলাম। মাহমুদ চা ও সিগারেটের জন্য ডাক-হাক পাড়তে

লাগল। কত উৎসাহ তার।

কিন্তু আমার মন উদ্বিগ্ন, মুখ আমার গম্ভীর। এতে করেও যদি বন্ধু আমার মুসলিম লীগের নমিনেশন না পায়। যদি সে ইলেকশনে হেরে যায়। কি কষ্টই না পাবে বেচারা মনে-মনে। কি আর্থিক লোকসানটাই না হবে তার। মাহমুদ আমাকে সিগারেট দিতে গিয়ে প্রথম আমার গাম্ভীর্য লক্ষ্য করল।

বলল: কি হইছে ভাই; এত গম্ভীর কেন তুমি?

আমি: তুমি কি লীগের নমিনেশন পেয়েছ?

মাহমুদ: পাইনি, তবে নিশ্চয় পাব।

আমি: লীগ নেতারা কথা দিয়েছেন, এই ত? সে কথার ওপর ভরসা করে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছ? ওদেরে তুমি চিন না?

হেসে মাহমুদ বলল: খুব চিনি।

আমি: চিন, তবে তারার নমিনেশন না পেয়েই লীগের প্রচারে আগে থেকে টাকা খরচ করে যাচ্ছ কেন? ধর যদি লীগের নমিনেশন নাই পাও, তবে ত আর লীগের বিরুদ্ধে দাড়ায়ে থাকা চলবে না।

মাহমুদ এবার হো-হো করে হেসে উঠল। বলল: তুমি দেখে নিও, লীগ আমাকে নমিনেশন দেবেই। অগত্যা যদি তারা নমিনেশন নাই দেয় তবে আর দাড়াব না। কিন্তু দোহাই তোমার খোদার, একথা যেন প্রকাশ করো না।

আমি: তোমার অনিষ্ট হয় এমন কোন কাজই আমা থেকে হবে না। কিন্তু আমি বলি কি, লীগের নমিনেশন না পাওয়া পর্যন্ত টাকা-কড়ি ব্যয় করা তোমার স্থগিত রাখা উচিৎ। যদি প্রচার কিছুকিছু করতেই চাও, তবে নিজের প্রচার কর - লীগের প্রচার নয়।

মাহমুদ স্বচ্ছন্দ উচ্চ হাসি হেসে বলল: তুমি এ সব বুঝবে না ভাই। আগে থেকে জনমত আমার পক্ষে না আনলে লীগ নেতারা আমাকে নমিনেশন দিবেন কেন?

বুঝলাম; মাহমুদটার সত্যই মাথা খারাপ হয়েছে। ওর জন্য বিশেষতঃ,

ওর স্ত্রী-পুত্রের জন্য, আমার খুবই ভাবনা হল।

গম্ভীর মুখে বিদায় নিলাম : আসবার সময় বলে এলাম : টাকা-পয়সাটা একটু দেখে-শুনে ব্যয় করো।

আমার জন্য তুমি কোনো ভাবনা করো না, ভাই।—বলে মাহমুদ আমাকে গেট পর্যন্ত আগায়ে দিয়ে গেল।

৮

বাজারে রাষ্ট্র হয়ে গেল : মাহমুদ সাহেবই লীগের নমিনেশন পাবেন।

সবারই মুখে ঐ এক কথা। কি করে জানি না এটাও বাজারে প্রচার হয়ে গেল যে, লীগের সভাপতি নবাব সাহেব, সহ-সভাপতি মওলানা সাহেব ও সেক্রেটারি খান বাহাদুর সবায় মাহমুদের নিকট ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন।

অন্যের কথা দূরে থাক, আমরা নিজেরাও এসব কথা প্রচার করতে লাগলাম। কারণ আমরাও কি করে জানি না, এ সব কথা বিশ্বাসও করে ফেলেছিলাম।

কেউ যদি বলত : আমরা মাহমুদের নিজের মুখে শুনেই ওসব কথা বলেছি, তবে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করতাম। বলতাম শুধু মাহমুদ নিজে বলবে কেন? দুনিয়ার সবাই ত বলছে। সত্য না হলে অত লোক জানল কি করে? দুনিয়ার সবাই ত আর মাহমুদের মুখে শুনে নাই।

কথাটা যতই রাষ্ট্র হল, মাহমুদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ততই ঘাবড়ায়ে গেলেন : তাঁদেরও অনেকে ধরে নিলেন, মাহমুদের লীগ নমিনেশন পাওয়া আর রুখা যাবে না।

ক্রমে তারা নিরুৎসাহ হয়ে আস্তে-আস্তে সরে পড়তে লাগলেন।

মাহমুদের "যিন্দাবাদী" মিছিলেও ক্রমে লোক বাড়তে লাগল। যখন মহল্লার অধিকাংশেই এটা বুঝে ফেলল যে, লীগ নমিনেশন মাহমুদের

হাতের মুঠায়, তখন মাহমুদের মিছিলে টাকা-টাকা ভাড়া করা ছেলে-ছোকরা ছাড়া বিনা টাকারও বহুত লোক জুটতে লাগল। এমন কি শেষ পর্যন্ত একদম বিনা-টাকাতেও মাহমুদের মিছিল ভারি হতে লাগল।

অতএব মাহমুদ আস্তে-আস্তে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিল। শুধু পান-সিগারেটের খরচটা বহাল থাকল।

এ আবহাওয়ার মধ্যে যখন প্রার্থী বাছাইর জন্য লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভা বসল, তখন মাহমুদের কেসটা একরূপ নির্ধারিত।

লীগের নেতাদের প্রত্যেকেই মনে-মনে ভাবছিলেন, তিনি নিজে ছাড়া আর সবাই মাহমুদ সাবকে কথা দিয়ে বসে আছেন। বৈঠকের সাধারণ সদস্যেরা সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে মাহমুদ সাবই ঐ ওয়ার্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থী।

এমতাবস্থায় মাহমুদ সাহেবের বিরুদ্ধতা করে একজন নিশ্চিত প্রার্থীর বিরাগভাজন কেউই হতে চাইলেন না। কারণ তাঁরা নিজেরাও মেম্বর-ডিপুটি মেয়রগিরির প্রার্থী।

যথাসময়ে মাহমুদের ওয়ার্ডের আলোচনা উঠল। লীগের সেক্রেটারি খান বাহাদুর সাহেব মিঃ মাহমুদের বহুত-বহুত তারিফ করলেন। লীগের প্রতি মাহমুদ সাহেবের প্রীতির বহু নিদর্শন দিলেন এবং একমাত্র মাহমুদ সাহেবেরই লীগ নমিনেশন পাওয়া উচিৎ বলে মত প্রকাশ করলেন। অবশেষে নিজেই মাহমুদের নাম প্রস্তাব করে উপসংহারে শুধু এটুকু জুড়ে দিলেনঃ লীগ মুসলিম জাতির জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলেও দরিদ্র প্রতিষ্ঠান; মাহমুদ সাহেব ত খোদার ফযলে যুদ্ধের কন্ট্রাক্টরিতে বেশ দু'পয়সা রোজগার করছেন; অতএব, তিনি লীগ তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা দান করবেন, এটাই তাঁর প্রতি লীগের সনির্বন্ধ অনুরোধ। এটা দাম-দস্তর নয়, এটা অনুরোধ মাত্র।

সকলের দৃষ্টি পড়ল মাহমুদের দিকেঃ সবারই চোখ কৌতূহলে উজ্জল। মাহমুদ সাহেব কি বলেন?

মাহমুদ ধীরে-ধীরে উঠে, মিষ্ট হাসি হেসে নবাবী ধরনে মাথা ঝুকায়ে

বলল : জাতীয় প্রতিষ্ঠান লীগের এ হুকুম আমি মাথা পেতে নিলাম।

সভাশুদ্ধ করতালি পড়ে গেল। আনন্দ প্রকাশটি ঠিক ইসলামী ধরনে হল না বলে দু'একজন মৌলবী সাহেব আপত্তি করায় সবাই "মারহাবা মারহাবা" করতে লাগলেন। কেউ-কেউ তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে চীৎকার করে উঠলেন : মাহমুদ সাব যিন্দাবাদ।

সভাশুদ্ধ এবং বারান্দায় ও বাহিরে দাঁড়ানো জনতা প্রতিধ্বনি করল : মাহমুদ সাব যিন্দাবাদ।

৪

কোনদিন লীগের কোন কাজ না করে, এমন কি লীগ আফিসের ও সভা-সমিতির ছায়া না মাড়ায়েও মাহমুদ কি করে লীগের নমিনেশন পেয়ে গেল, মহল্লার সব লোকই বা কি করে মাহমুদের এমন সমর্থক হয়ে গেল, এ রহস্যের কথাই আমরা বন্ধু-বান্ধবরা আমার বাসায় বসে আলোচনা করছিলাম।

লোকটা নিশ্চয়ই চোরা-সমাজসেবী। নিশ্চয়ই সে গোপনে জন-সেবা করে থাকে। নিশ্চয়ই তার ডান হাতের দান বাম হাত জানতে পারে না। নইলে আমরা তার বন্ধু হয়েও তার এত জনপ্রিয়তার একটুও খবর রাখি না।

এমন সময় রুগ্ন-ক্লান্ত মুখে উস্ক-খুস্ক বেশে মাহমুদ এসে হাযির। সে একা নয়, সংগে আরেক ভদ্রলোক।

ঐ চেহারায় মাহমুদকে দেখে আমরা তার হিতৈষী বন্ধুরা সবাই চিন্তিত হলাম।

প্রায় সমস্বরেই সবাই প্রশ্ন করলাম : কি হয়েছে তোমার মাহমুদ? এমন রুগ্ন দেখাচ্ছ কেন?

সে বলল, কিসে কি হল মাহমুদ নিজেই বুঝতে পারছে না।

অতিরিক্ত খাটনির দরুনই হোক আর যে কারণেই হোক, মাহমুদের শরীরটা একেবারে ভেংগে পড়েছে। অনেক দিনের চাপা শূল বেদনাটা, অর্শটা এবং বুকের ধড়ফরানিটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরা ধরে পড়েছে: যদি এই শরীর নিয়ে মাহমুদ ইলেকশনে কন্টেস্ট করে, তবে সে মারা যাবে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান লীগের ইযযতের জন্য মাহমুদের মারা পড়তেও আপত্তি ছিল না। তবে কি না বুড়া মা, যুবতী স্ত্রী ও অপগণ্ড ছেলে-মেয়েরা রয়েছে। শুধুমাত্র তাদের মুখ চেয়েই অতএব মাহমুদ সাব্যস্ত করেছে, সে নির্বাচনে প্রতি-যোগিতা করবে না। তার বদলে তার সংগীকে লীগের নমিনেশন দেয়া উচিৎ। এখন আমাদের মত কি? আমাদের মত ছাড়া সে ত কিছু করতে পারে না।

এতক্ষণে আমরা মাহমুদের সংগীর পরিচয় পেলাম। তিনি মাহমুদের ওয়ার্ডের অন্যতম প্রার্থী। চামড়ার সদাগর, দানে মোহসিন, পরোপকারে হাতেমতাই।

বলতে-বলতে মাহমুদ হাঁপায়ে পড়ল। সে আমাদের সকলের নিকট ক্ষমা চেয়ে একটা সোফায় শুয়ে পড়ল। তার শরীর এত দুর্বল।

এ অবস্থায় আমাদের কি করতে হবে?

লীগ সভাপতি নবাব সাবের কাছে আমাদের সবার সদলবলে গিয়ে মাহমুদকে খালাস করে আনতে হবে।

আমরা আর কি করি? বন্ধুকে ত আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ফেলে দিতে পারি না। আমরা রাযী হলাম। লীগ অফিসে অর্থাৎ নবাব সাবের বাড়িতে গেলাম।

মাহমুদ ও তাঁর সংগী চামড়ার সদাগর সাবও আমাদের সংগে গেলেন।

লীগ-নেতারা বৈঠক করছিলেন। মাহমুদকে দেখে ত তাঁরা রেগে টং। নবাব সাব বললেন: আপনার কথাই হচ্ছিল মিঃ মাহমুদ। ফাঁকি দিয়ে নমিনেশন নিয়ে দিব্বি আরামে বাড়ি বসে আছেন। ইলেক-শনের তারিখ এসে পড়ল, অথচ না করছেন প্রচার, না দিচ্ছেন ওয়াদাকরা

পাঁচ হাজার টাকা। ইলেকশনে হারলে আপনার বদনাম হবে না—বদনাম হবে লীগের—তার মানে আমার। আপনারে চিনে কে?

আমরা সমস্বরে মাহমুদের ওকালতি শুরু করলাম। ওর সাংঘাতিক অসুখের কথা বললাম। ওর চেহারার দিকে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। এমন কি, উৎসাহের বেগে এবং বন্ধুত্বের খাতিরে, মাহমুদ নিজে যা বলেনি তাও বলে ফেললাম। বললাম: ডাঃ রায় দেখে মাহমুদকে কম্‌প্লিট রেস্ট নিতে বলেছেন।

নবাব সাব আরও ক্ষেপে গেলেন। মাহমুদের দিকে কুদে উঠে বললেন: তার মানে আপনি বিনা ক্যানভাসেই জিততে চান?

আমরা বলতে যাচ্ছিলাম যে, মাহমুদ প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করা সাব্যস্ত করেছে।

মাহমুদ হাতের ইশারায় আমাদের সবাইকে চুপ করায়ে নিজেই বলল: আমি হারলে লীগের বদনাম হবে, আপনার নেতৃত্বে দাগ পড়বে, এটা আমি বুঝতে পারছি। আর এটাও বুঝতে পারছি যে; ক্যানভাস না করলে আমার জিতবার চান্‌স নাই। কিন্তু আমি কি করতে পারি? প্রাণ হারায়ে ত আর ইলেকশন করতে পারি না।

নবাব সাহেব ছাদ ফাটায়ে গর্জন করে উঠলেন: না পারেন, সরে পড়ুন। লীগের নমিনেশন ফিরায়ে দিন।

মাহমুদ কাচু-মাচু হয়ে বলল: তা কি করে হয়, নবাব সাব? আমি যে মারা পড়ব। আমি যে অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছি।

নবাব: ক্যানভাসও করবেন না, নমিনেশনও ফেরত দিবেন না। এ কেমন কথা? কি বিপদেই পড়েছি আপনারে নিয়ে।

মাহমুদ: আপনাদেরে বিপদে ফেলার জন্য আমি খুবই দুঃখিত স্যার। কিন্তু আমার নিজের বিপদের কথা ভেবে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

নবাব সাব কি চিন্তা করে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বললেন: কত খরচ হয়েছে আপনার?

মাহমুদ: নগদ দশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছি। কাজার

দেনাও হাজার পাঁচেকের বেশী বৈ কম হবে না।

নবাব : তাহলে পনের হাজার টাকা না পেলে আপনি ছাড়বেন না?

মাহমুদ : কি করে ছাড়ি? আমি যে মারা পড়ব, নবাব সাব।

নবাব : প্রার্থী কেউ আর আছে যে এই টাকা দিবে?

মাহমুদ তাড়াতাড়ি সংগী সদাগর সাবকে দেখায়ে দিয়ে বললেন : ইনি লীগের একজন মস্ত বড় মো'তেকাদ। পাকিস্তানে বিশ্বাসী। দানে মোহসিন। পরোপকারে হাতেম তাই।

নবাব : রাখুন আপনার বাচলতা। দেখুন আপনি লীগ নমিনেশন চান?

সদাগর : জি, হুজুর, চাই যদি মেহেরবানি করে দেন।

নবাব : আপনি পাকিস্তান মানেন?

সদাগর : যদি কর্পোরেশনে যেতে পারি, তবে মানতে কোনো আপত্তি নেই।

নবাব : বেশ। তাতেই হবে। কিন্তু মাহমুদ সাবের পনের হাজার টাকা দিতে হবে। লীগ তহবিলেও পাঁচ হাজার দিতে হবে।

সদাগর কি বলতে যাচ্ছিলেন। মাহমুদ চোখ গরম করাতেই তিনি থেমে গেলেন। বললেন : অগত্যা দিতেই হবে।

নবাব : এবার আর ওয়াদা নয়, ক্যাশ। টাকা এনেছেন?

টাকা আদান-প্রদান হয়ে গেল।

আমরা সবাই লীগ অফিস অর্থাৎ নবাব সাবের বাড়ি থেকে বের হলাম। মাহমুদ নিয়ে বের হল টাকা; সদাগর সাব নিয়ে এলেন লীগের নমিনেশন; আর আমরা নিয়ে এলাম চরম বিস্ময়।

সদাগর সাবের মোটরেই গিয়েছিলাম। ফিরে আসতে তাতেই সবাই চড়লাম।

মোটরে চড়েই সদাগর সাব রাগে গড়গড় করে বললেন : এ কি রকম ব্যবহার আপনার, মাহমুদ সাব? খরচের কথা বলেই ত সকালে দশ হাজার টাকা নিলেন। ভদ্রলোকদের সভায় নিয়ে বেকায়দায় ফেলে

আবার সেই খরচের নামেই আরো পনের হাজার আদায় করলেন ?

মাহমুদ হেসে বলল : সকালের দশ হাজার খরচের টাকা ছিল না, সেটা ছিল আমার-পাওয়া সিটের বিক্রয় মূল্য। খুব সস্তাই কিনলেন বলতে হবে। তিন বছরে অনেক পঁচিশ হাজার তুলে ফেলবেন।

পরদিন 'একমাত্র দৈনিক' খবরের কাগজে বার হল : মাহমুদ সাবের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁর জায়গায় প্রবীণ লীগ-কর্মী পাকিস্তান বিশ্বাসী ইসমাই সদাগর সাব লীগ-প্রার্থী মনোনীত হলেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

———

অনারেবল মিনিস্টার

১

একচোটে এম. এ. ও বি. এল. পাশ করিয়া যেদিন শওকত ইউনি-ভার্সিটির বেড়া ভাংগিল, সেদিন সে মনে করিল এইবার শ্রমের পালা শেষ, ভোগের পালা শুরু।

তারপর অনেক জুতা ছিড়িয়া, অনেক সুপারিশ যোগাড় করিয়া, অনেক ইন্টারভিউ দিয়াও যখন ডিপুটিগিরি, মুনসেফরিগি, সাবরেজিস্টারি, দারোগাগিরি, এমন কি স্কুলমাস্টারিও পাইল না, তখন সে এক বন্ধুর পরামর্শে আইন সভার মেম্বরগিরির প্রার্থী হইল।

কাজটা করিল সে খুবই রিস্ক লইয়া। কারণ যামানতের টাকাটা সে আদায় করিল শ্বশুরের ধানবেচা টাকা হইতে এবং এই টাকা আদায় করিতে বিবি তালাক দিবার ভয়ও দেখাইতে হইয়াছে প্রকারান্তরে।

যা হোক, বন্ধুর পরামর্শের ফল ফলিল। রাইভেল ক্যাণ্ডিডেট খান বাহাদুর সাহেব শওকতকে অনুরোধ করিল উইথড্র করিতে। এই অনুরোধের সংগে শওকতের যা প্রাপ্তি ঘটিল, মেম্বরি বেতনের আড়াই শো টাকা সুদে খাটাইয়া কুড়ি বছরেও সে টাকা পাওয়া যাইত না। ফলে শওকত নিজের ক্যাণ্ডিডেচার উইথড্র করিল। খান বাহাদুর সাহে-বের দেওয়া টাকা হইতে শ্বশুরের দেনা পরিশোধ করিয়া শওকতের হাতে যা থাকিল, তাতে এক বছর সে স্বচ্ছন্দে বসিয়া খাইতে পারিবে।

কিন্তু এটাই শওকতের একমাত্র বা সবচেয়ে বড় লাভ নয়। সবচেয়ে বড় লাভ তার হইল এই যে, খানবাহাদুর সাহেব কোরআন-হাতে ওয়াদা করিয়াছিলেন, তিনি শওকতকে একটা ভাল চাকরি যোগাড় করিয়া দিবেন।

তারপর খানবাহাদুর সাহেব মেম্বর হইয়াছেন। খোদার ফযলে এবং শওকতরার প্রাণ-পণ চেষ্টা ও দিন রাত দৌড়াদৌড়িতে খানবাহাদুর সাহেব অনারেবল মিনিস্টার পর্যন্ত হইয়াছেন।

কিন্তু শওকতের চাকুরি আজও হয় নাই।

খানবাহাদুর সাহেব যে চেষ্টা করেন নাই, তা নয়। চেষ্টা তিনি খুবই করিয়াছেন। ফলে অনেক সময় শওকত চাকুরি পাওয়ার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। এপয়েন্টমেন্ট লেটার টাইপ হইতেছে বলিয়া সে খবরও পাইয়াছে স্বয়ং অনারেবল মিনিস্টার খানবাহাদুরের মুখে। কাজে জয়েন করিবার জন্য আচকানও সে তৈরী করিয়াছে। কিন্তু শেষ বেলায় কি একটা অসুবিধার দরুণ শওকতের চাকুরি হয় নাই।

খানবাহাদুর সাহেব অর্থাৎ বর্তমানে অনারেবল মিনিস্টার সাহেব তখন অন্য চাকুরির দিকে শওকতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সেটা আগের চাকুরির চেয়ে অনেক ভাল। সত্য বলিতে কি, আগের চাকুরি না পাওয়ায় শওকতের ভালই হইয়াছে।

এইভাবে অনেক সুযোগ আসিয়াছে। সে সব সুযোগের প্রত্যেকটার আগেরটার চেয়ে অনেক গুণে ভাল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে তার একটাও ধরা যায় নাই। শওকতের অনেক নয়া আচকান পুরান হইয়াছে। কিন্তু তার চাকুরি হয় নাই। শওকত দেখিল, চাকুরির সুপারিশ পাইতে তখন শুধু জুতা ছিঁড়িত। এত বড় সুপারিশ লাভ করিয়াও তার চাকুরি পাইতে এখন আচকান ছিঁড়িতেছে।

২

বই-পুস্তকে লেখা হয় সকলেরই ধৈর্যের সীমা আছে। কিন্তু বই-পুস্তকের লেখকরা বোধ হয় জানেন না যে চাকুরী-প্রার্থীর ধৈর্যের সীমা নাই। শওকতেরও ধৈর্যের সীমা না থাকারই কথা। কিন্তু বয়সের ধৈর্য না থাকায় এবং চাকুরি পাওয়ার শেষ সীমা পচিশ ঘনাইয়া আসায় শওকত এ ব্যাপারে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

সে জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগ ত্যাগ করিয়া জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী হইয়া হিন্দুস্কুলে মাস্টারি নিবে, না স্থানীয় মুসলীম লীগকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া মন্ত্রীরায় বিরুদ্ধে জনসাধারণকে খেপাইয়া তুলিবে এই দুই অলটারনেটিভ স্কীম নিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করিবার পর আপাততঃ দ্বিতীয় পন্থাই আগে পরখ করিয়া দেখা উচিৎ বলিয়া তাঁর মনে হইল। তবে সত্য-সত্যই সে কাজে হাত দেওয়ার আগে খানবাহাদুর সাহেবের কানে কথাটা তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ, এটাও সে বুঝিতে পারিল।

খানবাহাদুরের কানে তোলা মানে তার লোকজনের কাছে বলা। সুতরাং এলাকায় খানবাহাদুর সাহেবের লোকজনের কাছে শওকত ঐ ধরনের কথা বলিতে লাগিল।

শওকত যা আশা করিয়াছিল তাই হইল। অল্পদিনের মধ্যেই সে সরকারী লেপাফায়-ভরা মিনিস্টার খানবাহাদুর সাহেবের নিজের দস্তখতী এক পত্র পাইল।

তাতে খানবাহাদুর লিখিয়াছেন, তিনি সরকারী 'টুওর' উপলক্ষে শীগগির দেশে আসিতেছেন। শওকত যেন খানবাহাদুর সাহেবের সংগে দেখা না করিয়া হঠাৎ কিছু করিয়া না বসে।

যথাসময়ে মন্ত্রী খানবাহাদুর সাহেব দেশে 'টুওর' করিতে আসিলেন।

খুব ধুমধামে তার অভ্যর্থনা হইল। বহু অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল। তাতে অনেক অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চাওয়া হইল। মাননীয় মন্ত্রী সাহেব সবগুলি প্রতিকারের যথারীতি আশ্বাস দিলেন।

জনসাধারণ খুশী হইয়া বাড়ি গেল।

ও সবে শওকতের স্বভাবতঃই তেমন উৎসাহ ছিল না। তবু নিজের স্বার্থের খাতিরেই ও-সব অনুষ্ঠান সে এড়াইতে পারিল না।

মন্ত্রী খানবাহাদুর সাহেব অনুষ্ঠান শেষে শওকতকে ডাকাইলেন এবং অনেক তসল্লি ও যুক্তিতর্ক দিয়া শওকতকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, শওকতের রাগ করা উচিৎ নয়; ধৈর্যও তার হারান উচিৎ নয়।

ধৈর্যের কথা বলায় শওকত আবার খেপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু খান-বাহাদুর সাহেব বুঝাইলেন যে, এতদিন যত চেষ্টা হইয়াছে, সবই অন্য মন্ত্রীর দফতরে। এবার খানবাহাদুর সাহেব নিজের দফতরেই শওকতের চাকুরির ব্যবস্থা করিবেন।

তখন শওকতের রাগ কমিল। সে বুঝিল, এটা কাজের কথা বটে।

তারপর শওকতের জন্য খানবাহাদুর সাহেবের নিজের দফতর শিক্ষা-বিভাগে কি চাকুরির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তার তন্নতন্ন বিচার হইল। কিন্তু অবশেষে এটা আবিষ্কৃত হইল যে শওকতের সরকারী চাকুরির বয়স পার হইয়া গিয়াছে।

অতএব সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া এটা সাব্যস্ত হইল যে, শওকত নিজেকে হেডমাস্টার করিয়া নিজ গ্রামে একটি হাইস্কুল স্টার্ট করিবে এবং শিক্ষামন্ত্রী খানবাহাদুর সাহেব সেটা মনযুর করাইয়া মোটা রকমের সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

যেহেতু এটা মাননীয় মন্ত্রী সাহেবের নিজের দফতর, কাজেই এতে কোনো বাধাবিঘ্ন হইতেই পারে না। একথা স্বয়ং শওকত যেমন বুঝিল, গাঁয়ের সকলেও তেমনি বুঝিল। এইবার শওকতের বরাত খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া সকলেই তার মোবারকবাদ দিল।

শওকত বুঝিল, এতদিনে সত্যই তার একটা হিল্লা হইল।

৩

শওকত হাইস্কুল স্টার্ট দিল। দিনরাত খাটিতে লাগিল। আশে-পাশে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে কোনো হাইস্কুল না থাকায় শওকতের চেষ্টা সফল হইল।

স্কুল জমিয়া উঠিল। ছাত্রে স্কুল-প্রাঙ্গণ গমগম করিতে লাগিল।

স্বয়ং মাননীয় মন্ত্রী সাহেব স্কুল-মনযুরির ও সাহায্যের ভার নিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ না থাকায় অন্যান্য পুরাতন স্কুল হইতে ছাত্ররা দলে-দলে বাড়ির কাছের নূতন স্কুলে চলিয়া আসিল।

৫—

কিন্তু অনেক লেখালেখিতেও মনজুরি বা সাহায্য আসিল না।

অবশেষে ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ বৈঠকে প্রস্তাব পাশ হইল, স্বয়ং হেডমাস্টার মিঃ শওকত আলী সাহেব রাজধানীতে গিয়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও স্কুলের রিকগনিশন ও গ্র্যান্টের ব্যাপারে বিশেষ তদবির করিবেন। এই উপলক্ষে শওকতের যাতায়াত খরচা বাবদ চাঁদা উঠিল। শিক্ষকরা যাঁর-তাঁর বেতন হইতে এই চাঁদা তুলিলেন। কারণ ঠেকা তাঁদেরই বেশী।

শওকত রাজধানীতে আসিয়া এক বন্ধুর মেসে উঠিল। মন্ত্রী খানবাহাদুর সাহেবের বাড়ি গিয়া শুনিল তিনি টুওরে গিয়াছেন।

ওটা ছিল বিশ্ব-যুদ্ধের সময়। রাজধানীতে তখন ঘন-ঘন সাইরেন বাজিতেছে এবং মাঝে-মাঝে দুশমনের হাওয়াই হামলাও চলিতেছে। কিন্তু জীবন বিপন্ন করিয়াও কিছুদিন রাজধানীতে থাকিতে শওকত বাধ্য হইল। কিছুদিন থাকার পর তার মনে হইল, এই হাওয়াই হামলার কারণেই মন্ত্রী সাহেব টুওর হইতে আসিতে দেরি করিতেছেন।

শওকত চাঁদার টাকায় রাজধানীতে আসিয়াছে। মন্ত্রীর সাথে দেখা না করিয়া সে ফিরিতে পারে না। বিশেষতঃ এই সাক্ষাতের উপরই তার নিজের এবং স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অতএব শওকতের যিদ হইল সে মন্ত্রীর সংগে দেখা না করিয়া ফিরিবে না। কাজেই জানটি হাতে লইয়া এ. আর. পি শেলটারে-শেলটারে দৌড়াদৌড়ি করিয়া অনেক দিন অপেক্ষার পর শওকত একদিন শুনিল, মন্ত্রী সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু ফিরিলে কি হইবে? সকালে গিয়া শুনে মন্ত্রী সাহেব চীফ মিনিস্টারের বাড়িতে, বিকালে গিয়া শুনে তিনি পার্টি মিটিং-এ, দুপুরে গিয়া শুনে তিনি সেক্রেটারিয়েটে। এমনি সব দুর্নিবার কারণে অবসরের অভাবে কিছুতেই সে মন্ত্রীর দেখা পাইল না।

যখন এইভাবে আরও এক সপ্তাহ গেল, তখন সে স্থির করিল, যেমন করিয়াই হোক, সেক্রেটারিয়েটেই সে মন্ত্রী সাহেবের সংগে দেখা করিবে।

৪

চাকুরির উমেদারিতে সে অনেকবার রাজধানীতে আসিয়াছে। খান-বাহাদুর সাহেব এবং আরো দুচারজন মন্ত্রীর সাথে দেখাও সে করিয়াছে।

কিন্তু সে সব মোলাকাত হইয়াছে মন্ত্রীরার বাসায়। সেক্রেটারিয়েটে আর কখনো সে যায় নাই। তার দরকারও কোনদিন হয় নাই।

সেক্রেটারিয়েটে যাওয়া তার জীবনে এই প্রথম। কাজেই একদিন সে আগের রাত্র হইতেই উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া, খুব ভোর হইতেই মেসের বাবুর্চিকে তলব-তাগাদায় অস্থির করিয়া এবং বন্ধু-বান্ধবরার কাপড়-চোপড়ের যোগাযোগ করিয়া নিজের পোশাক ঠিক করতঃ যথা-সময়ের অনেক আগেই সেক্রেটারিয়েটের বারান্দায় গিয়া হাযির হইল। সলজ্জ সন্তর্পণে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মন্ত্রী সাক্ষাতের কায়দা-কানুন অবগত হইয়া সে ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করিল এবং কার্ড দাখিল করিয়া ডাকের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে ডাক পড়িল। বিভিন্ন পুলিশের গেট পার করিয়া যেভাবে শওকতকে শেষ পর্যন্ত খানবাহাদুর মন্ত্রী সাহেবের কাছে লইয়া যাওয়া হইল, তাতে শওকতের আরেক দিনের কথা মনে পড়িল। তার এক কংগ্রেসী বন্ধুকে একবার সে জেলখানায় দেখিতে গিয়াছিল। সেখানেও সে এমনি-ধারা পুলিশের কড়াকড়ির মধ্যে গেটের পর গেট ও কামরার পর কামরা পার হইয়া বন্ধুর দেখা পাইয়াছিল।

—'এই কামরার মধ্যে যান'—বলিয়া একটা দরজা দেখাইয়া চাপরাশীটা সরিয়া পড়িল।

শওকত ঢুকিবে কি না ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেখিল, বারান্দায় আরও অনেক উর্দি-পরা চাপরাশী চেয়ার-বেঞ্চিতে বসিয়া তাস খেলিতেছে, বিড়ি টানিতেছে এবং খৈনি খাইতেছে। কিন্তু তারা কেউ শওকতের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। শওকতও কাজেই কাকেও কিছু জিজ্ঞাস করিতে পারিল না।

অগত্যা দরজা ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

দেখিল: খানবাহাদুর সাহেব মস্ত-বড় টেবিলের সামনে বসিয়া চেয়ারের সিরানায় হেলান দিয়া ঘুমাইতেছেন অথবা শুধুই চোখ বুজিয়া আছেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এবং প্রয়োজন হইলে ঘুম ভাংগাইবার উদ্দেশ্যে শওকত বেশ একটু জোরেই আদাব আরয করিল।

ধড়মড় করিয়া মন্ত্রী সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন এবং শওকতকে দেখিয়া বলিলেন: ও আপনে শওকত মিয়া? কি খবর? কবে আস্‌লেন? বসুন। —বলিয়াই তিনি কিরিং-কিরিং করিয়া টেবিলের উপরস্থ কলিং বেল বাজাইলেন। কিন্তু কেন বাজাইলেন, কাকে ডাকিলেন কিছুই শওকত বুঝিল না।

কারণ, কেউ সাড়া দিল না।

তখন শওকত একটি চেয়ারে বসিল এবং সবিস্তারে সকল ঘটনা বয়ান করিল। মন্ত্রী সাহেবের গতদিনের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির কথাও স্মরণ করাইয়া দিল।

মন্ত্রী খানবাহাদুর সাহেব শওকতের সব কথা শুনিয়া চোখ হইতে চশমা জোড়া খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। দুই হাতের গাদায় চোখ দুইটি রগড়াইলেন। তারপর দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন: বলেন কি শওকত মিয়া? এখনও আমরার গাঁয়ের স্কুল মন্‌যুর হয় নাই? আমি ত কোন্‌দিন বলে দিয়েছি। না হবার কারণ কি? বেটা হিন্দুরার জ্বালায় কিছুই করবার উপায় নাই। সেকেণ্ডারি বিলটা পাশ না হওয়া পর্যন্ত ইউনিভারসিটির বেটারারে শায়েস্তা করা যাবে না।

শওকত দেখিল বড় বিপদ। সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল পাশ হওয়ার পরে তার স্কুল রিকগনিশন পাইতে হইলে শওকত মারা গেছে। কাজেই কবে সেকেণ্ডারি বিল আইনসভায় আসিতেছে, তা জানিবার প্রবল আগ্রহ জাগিয়া সে বলিল: মন্‌যুরিটাই না হয় ইউনিভার্সিটির হিন্দুরার হাতে কিন্তু সরকারী সাহায্যটা ত আপনারই হাতে। তারও ত কোনো খবর পেলাম না।

মাননীয় মন্ত্রী সাহেব রাগে লাল হইয়া গেলেন। বলিলেনঃ বলেন কি শওকত মিয়া, সাহায্য আজও পান নাই ?

শওকত উচ্চস্বরে বলিলঃ সাহায্য পেলে শুধু মজুরির জন্য কি আমি এই মাস খানিক ধরে জাপানী-বোমার নিচে বসে আছি ?

মন্ত্রী সাহেব আবার সজোরে স্প্রিং-এর বেলের বোতাম টিপিলেন। ক্রিরিং-ক্রিরিং করিয়া আবার বেল বাজিয়া উঠিল।

কেউ আসিল না।

অন্যারেবল মিনিস্টার আবার আরও জোরে আরো লম্বা করিয়া বেল বাজাইলেন।

তবু কেউ আসিল না।

মাননীয় মন্ত্রী সাহেব তখন গর্জন করিয়া হাঁকিলেনঃ কোই হ্যায় ?

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা গেল। কিন্তু 'কোই-ই-হ্যাইল' না।

অগত্যা মন্ত্রী সাহেব নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেনঃ মংলো।

মংলো নিশ্চয়ই মন্ত্রী সাহেবের কোন চাপরাশীর নাম। কিন্তু সে বোধ হয় অন্য কাজে গেছে; কাজেই সেও আসিল না।

তখন মন্ত্রী সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া 'বেটা হারামযাদা, কোথায় আড্ডা মারতে গেছে; আজই আমি বেটাকে ডিস্‌মিস করব।'

—বলিতে-বলিতে বাহির হইয়া বারান্দায় গেলেন।

শওকত শুনিল, বারান্দায় গিয়া মন্ত্রী সাহেব কাকে ধমকাইতেছেনঃ এই বেটা হারামযাদা, বেল যে দিলাম, সাড়া দিলি না কেন ? বসে-বসে কেবল আড্ডা মারা হচ্ছে, না ? আজই তোরে ডিস্‌মিস করব।

অবশেষে মন্ত্রী সাহেব মংলোকে ডিস্‌মিস করার বদলে সংগে লইয়া কামরায় ঢুকিলেন এবং চেয়ারে বসিয়া হুকুম দিলেন। ডিরেক্টর সাব কো সালাম দো।

ডিরেক্টর সাব মানে ডিরেক্টর-অব-পাবলিক ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ ডি. পি. আই.। শওকত বুঝিল, এবার তাঁর কাজ হইয়া গেল।

৫

চাপরাশী চলিয়া গেল। মন্ত্রী সাহেব টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া এক প্যাকেট পাসিং শো সিগারেট বাহির করিলেন। প্যাকেট হইতে নিজ হাতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া সেই সিগারেটটি এবং একটি দিয়াশ-লাই শওকতের দিকে আগাইয়া দিলেন।

বলিলেন: নিজে আমি সিগারেট খাই না; তবু বন্ধু-বান্ধবের জন্য রাখতে হয়। কাজেই ওটার ভালমন্দ আমি কিছু জানি না।

শওকত সিগারেটটা হাতে লইয়া দেখিল, খুব কম করিয়া হইলেও পনরদিনের আগের কিনা। দিন একটা করিয়া খরচ হইলেও এক প্যাকেট এতদিন থাকিত না।

যা হোক শওকত সিগারেট ধরাইল। অত্যন্ত পুরাতন শিদ্‌লে-যাওয়া বলিয়া তাতে সহজে ধূঁয়া আসিতেছিল না। তবু মন্ত্রীর দেওয়া সিগারেট বলিয়া সে চোয়ালের সমস্ত জোর দিয়া সিগারেট টানিতে-টানিতে ডিরেক্টরের আগমন পথ চাহিয়া রহিল।

এতক্ষণে শওকতের চোখ পড়িল মন্ত্রী সাহেবের টেবিলের উপর। টেবিল একেবারে সাদা, তার উপরে কোনো ফাইল নাই।

সে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল: শুনেছি মন্ত্রীরার অনেক ফাইল 'ডিল' করতে হয়। তবে আপনার টেবিল সাদা কেন?

মন্ত্রী সাহেব অপ্রস্তুত হইলেন। তাঁর মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। তিনি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন: অন্য লোকের কাছে অন্য কথা বলতাম। কিন্তু আপনি নিজের লোক; সত্য কথাই বলব। ফাইল আর আমরার কাছে আসে না। সবই 'ডিপার্টমেণ্টাল ডিল' হয়।

শওকত আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল: তবে কি আপনারার হাতে কোন কাজ নাই?

মন্ত্রী: তা—তা, কাজ থাকবে না কেন। পলিসি ত আমরারই ডিরেক্ট করে থাকি।

শওকত: ফাইল দেখতে পান না, তবে পলিসি ডিরেক্ট করেন কোথায়?

মন্ত্রী ঃ ফাইল দেখতে পাব না কেন ? কোনো ফাইল চেয়ে পাঠালেই তা আমরার কাছে আসে।

শওকত ঃ কই কোনো ফাইলই ত আপনার টেবিলে দেখতে পাচ্ছি না।

মন্ত্রী ঃ চেয়ে পাঠাই নাই আর কি ? চেয়ে পাঠাবার দরকার বোধ করি নাই।

শওকত ঃ তবে আফিসে এসে আপনারা করেন কি ?

মাননীয় মন্ত্রী সাহেব এবার মুশকিলে পড়িলেন। একটু ভাবিয়া বলিলেন ঃ আফিসে আমরা বড় আসি না। সে ফুরসত কোথায় আমরার ? আমরার ত প্রায়ই টুওর করতে হয়।

শওকত ঃ কিন্তু আগে-আগে ত মন্ত্রীরা ফাইল ডিল করতেন। টুওর কর-বার সময়ই পেতেন না। আর টুওর করলেও সংগে ফাইল নিয়া যেতেন।

মন্ত্রী ঃ তা ঠিক। কিন্তু তখন ত লড়াই ছিল না। এখন লড়াইর মওসুম। সব ফাইলই লাট সাহেবের স্বয়ং দেখতে হয়। লাট সাহেবের দেখার পর আমরার দেখায় আর দরকারই বা কি ? আর সময়ই বা কোথায় ? তাতে-যে সব কাজেই অযথা দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, লাট সাহেবের ইচ্ছা যে, আমরা ফাইলের মধ্যে ডুবে না থেকে দেশের জনসাধারণের সাথে 'টাচ্' রাখি। এই টাচ রাখবার জন্যই আমরা এখন প্রায়ই মফস্বলে টুওর করে কাটাই। এ উদ্দেশ্যে লাট সাহেবের সম্মতিক্রমে এবারকার বাজেটে খরচার বরাদ্দও বেশী ধরা হয়েছে। কারণ পপুলার মিনিস্টার হতে হলে জনগণের মধ্যেই কাজ করতে হবে বেশী।

শওকত ঃ ওঃ, বুঝলাম। তবে ত আপনারার সেক্রেটারিয়েটে না আসলেও চল্‌তে পারে।

মন্ত্রী ঃ হ্যাঁ, তা এক রকম চলতে পারে বটে। কিন্তু মাসের শেষ দিকে দু-চার দিন আসতেই হয়। কারণ, বিলটা ঠিক মত সাবমিট করতে গেলে নিজে থেকে না করলে হয় না।

শওকত ঃ চাপরাশী বেটারা আপনারে কেন গ্রাহ্য করে না, তা এতক্ষণে বুঝলাম।

মন্ত্রী : কি বুঝলেন ? গ্রাহ্য করে না কি রকম ?

শওকত : এই ত দেখলাম। মন্ত্রী দেখলে তারা আগের মত সেলামও দেয় না। বেল দিলে সাড়াও দেয় না।

মন্ত্রী : না, না, আপনি ভুল বুঝছেন। সেলাম দিবে না কেন ? চিনতে পারলে নিশ্চয়ই সেলাম দেয়। আসল কথা, ওরা আমরারে চিনতেই পারে না। আর বেচারারা চিনবেই বা কি করে ? আসি ত আমরা এখানে মাসে দু'চার দিন মাত্র। আর, বেল শুনে না আসার ব্যাপারটা কিছু নয়। দরজা বন্ধ ছিল বলেই বেচারা শুনতে পায় নাই। দরজা বন্ধ থাকলে যে দালানের ভিতর থেকে আওয়াজ বার হয় না, আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, বেড়ার ঘরে বাস করি কি না, তা বুঝতে পারি না।

৬

ইতিমধ্যে চাপরাশী ফিরিয়া আসিয়া জানাইল : ডি. পি. আই. সাবকা আনেকি ফুসরত নেহি হ্যায় ; যরুরত হোসেনে সাবকে সাথ, টেলিফোন পর বাত কিজিয়ে।

—বলিয়া চাপরাশী দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শওকত স্তম্ভিত হইল।

শওকতের মুখের দিকে চাহিয়া মন্ত্রী সাহেব বুঝিলেন, এ ব্যাপারেও শওকত ভুল বুঝিতেছে। তাই তিনি ফোনের রিসিভারটা তুলিতে তুলিতে বলিলেন : আহা, বেচারার ফুরসত হবে কোথা থেকে ? এত কাজের চাপ দিছি বেচারার উপর।

ইতিমধ্যে বোধ হয় ফোনের অপর দিকের সাড়া পাইয়াছিলেন। কারণ মন্ত্রী সাহেব ইংরেজীতে বলিলেন। প্লীয পুট মি অন্টু দি ডি. পি. আই.।

অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া মাননীয় মন্ত্রী অশুদ্ধ ইংরেজীতে নিম্নলিখিতরূপে কথা বলিলেনঃ আমি কি ডি. পি. আই.র সংগে কথা বলতে পারি ?

—আপনাকে আমি অমুক যিলার অমুক থানার একটা স্কুলের সাহায্য সম্পর্কে অনুরোধ করছিলাম ; তা আপনার স্মরণ আছে কি ?

—না, না, আপনার কাজে ইণ্টারফিয়ার করব কেন ? আমার নিজের গ্রামের স্কুল কি না, তাই আপনারে অনুরোধ করা মাত্র।

—তা ত বটেই, আইন মোতাবেক সব আয়োজন হওয়া ত চাই-ই। তবে কি না আমার নিজের নির্বাচনী এলাকায়—

—বেশ, বেশ, থ্যাঙ্ক ইউ।

মন্ত্রী সাহেব রিসিভার রাখিয়া হাসি মুখে শওকতকে কি বলিতে গেলেন। কিন্তু শওকতের সন্দিগ্ধ মুখ দেখিয়া মন্ত্রী সাহেবের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

মাননীয় মন্ত্রী সাহেব শুধু বলিলেনঃ যতটা বলবার বললাম ত ; দেখেন এইবার কি হয়।

শওকত তার রাগ গোপন করিতে পারিতেছিল না। সে বলিলঃ কি হবে, তা আমি বেশ বুঝতে পারতেছি। কিন্তু আমি শুধু ভাবতেছি, আপনারারে অনারেবল মিনিস্টারই বা বলা হয় কেন ? আর আপনারাই বা এতে আছেন কি করতে ?

অনারেবল মিনিস্টার সাহেব এইবার প্রাণখোলা উচ্চ হাসি হাসিলেন এবং বলিলেনঃ মিনিস্টার না বলে আমরারে আর কি বলবেন ? আর আমরা এতে আ।ছ কেন, তা বোঝা কি এতই কঠিন ? আপনি নিজে এই মন্ত্রিত্ব পেলে কি আসেন না ?

শওকত এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। কারণ, সত্যই ত। সেও ত একটা অনারেবল জেণ্টলম্যান অর্থাৎ শিক্ষিত সম্মানী ভদ্রলোক। একটা চাকুরির জন্য সে কি আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে নাই ? চাকুরি মানে রোযগারের পথ। মাইনা বেশী আর কাজ কম, এমন

চাকুরিই ত সর্বোত্তম। এই হিসাবে এমন মন্ত্রিত্বই শ্রেষ্ঠতম চাকুরি। এটা পাইলে সে নিজে কি ছাড়িয়া দিবে? বেচারা খানবাহাদুরকে দোষ দিয়া লাভ কি?

সে মন্ত্রী সাহেবের নিকট বিদায় হইল এবং সেই দিনের ট্রেনেই রাজধানী ছাড়িয়া বাড়ি রওনা হইল।

যথাসময়ে শিক্ষাবিভাগ হইতে শওকতের নামে সরকারী-লেপাফায় এক পত্র আসিল। তাতে শওকতকে জানান হইয়াছে যে, অনারেবল মিনিস্টারকে দিয়া ডিপার্টমেন্টের উপর আন্‌ডিউ ইনফ্লুয়েন্স করিবার চেষ্টা করায় শওকতয়ার স্কুল মন্‌যুরি বা সাহায্য পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐ স্কুল ও স্কুলের হেড্‌মাস্টারের নাম কাল খাতায় লেখা হইল।

শওকত শিক্ষকতায় রিযাইন দিল এবং যুদ্ধ-বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করিয়া রাওয়ালপিণ্ডি চলিয়া গেল।

কাত্তিক—১৩৫১

আহা! যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম!

১

ওয়াহেদ মাস্টার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। আমার বিশেষ বন্ধু। পুরাতন সহকর্মী। খিলাফত-আন্দোলন, স্বরাজ-আন্দোলন, প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান-আন্দোলন প্রভৃতি সব আন্দোলনেই তিনি আমার সাথে কাজ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেখানে আন্দোলন, সেখানেই ওয়াহেদ মাস্টার। এ সব আন্দোলনে আর যার যত সুবিধাই হইয়া থাকুক না কেন, ওয়াহেদ মাস্টারের কোন সুবিধা হয় নাই।

তাই আন্দোলনে ক্লান্ত হইয়া কয়েক বৎসর আগে শুধুমাত্র বিশ্রাম লইবার আশাতেই তিনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁর কপালে বিশ্রাম ছিল না। কয়েক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন নামে আরেকটা আন্দোলন দেখা দেয়। ওয়াহেদ মাস্টারের কোনো ছেলে-পেলে নাই। কিন্তু পরের ছেলে-পেলেকে তিনি বড় ভালবাসেন। যেদিন ঢাকায় স্কুল-কলেজের ছেলেরার উপর গুলী হইয়াছে খবর পাইলেন, সেই দিনই স্কুল ছুটি দিয়া বক্তৃতায় বাহির হইলেন।

এতেও তাঁর বিশেষ কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু কিছুদিন আগে তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের কুড়ি বৎসরের প্রেসিডেন্টকে হারাইয়া বিপুল সংখ্যাধিক ভোটে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পরাজিত প্রেসিডেন্ট সাহেব স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে ধরিয়া কর্তৃপক্ষের বিনা-অনুমতিতে নির্বাচনে দাঁড়াইবার অপরাধে ওয়াহেদ মাস্টারকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করাইলেন এবং রাষ্ট্র-বিরোধী কাজের অভিযোগে কয়েক দিন জেলও খাটাইলেন।

অবশেষে একদিন শুনিলাম, ওয়াহেদ মাস্টারের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। উম্মাদ হওয়ার অপরাধে তাঁর মেম্বরগিরি বাতিল হইয়া গিয়াছে।

এমন একটা ভাল মানুষ বুড়া বয়সে পাগল হইয়া গেলেন, শুনিয়া মুখে যদিও একবার মাত্র আহা করিলাম, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা উহু অনেকক্ষণ ধরিয়া অনুভব করিলাম। অবশ্য আর কিছু করিতে পারিলাম না। লোকটার পরিবার নিশ্চয় কষ্ট পাইতেছে। তা থাক, দেশের কত জায়গায়, কত লোকই ত অমন কষ্ট পাইতেছে।

ব্যাপারটা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

২

কিন্তু ভুলিতে পারিলাম না।

একদিন হঠাৎ ওয়াহেদ মাস্টার আমার বাসায় হাযির। প্রাথমিক আলাপ-সালাপে বুঝিলাম, যতটা শুনিয়াছিলাম, আসলে তাঁর মাথা ততটা খারাপ হয় নাই। কিম্বা হইয়া থাকিলেও অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছেন।

খুশী হইলাম। বলিলাম: কিসের লাগি শহরে আসছেন মাস্টার সাব? দুচার দিন থাকবেন ত?

ওয়াহেদ মাস্টার ব্যস্ততার সাথে বলিলেন: না, না, আমি কি থাকবার পারি? আমার এখন মোটেই ফুরসত নাই। আমি ঠিক করছি, এবার প্রধান মন্ত্রী হব। শীঘ্রই কাজে জয়েন করাই আমার ইচ্ছা। সেজন্য আমি রাজধানীতে রওনা হইছি। পথে আপনার সাথে দেখা করতে আসছি।

এতক্ষণে বুঝিলাম, সত্যই লোকটার মাথা বিগড়াইয়াছে। অতি সাবধানে বলিলাম: এক চোটে প্রধানমন্ত্রী? আগে ছোটখাট মন্ত্রী হয়ে ট্রেনিং নিয়া নিলে হত না?

ওয়াহেদ মাস্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহের চোখে আমার দিকে নযর করিলেন। বলিলেন: কেন, দোষ কি? সোজাসুজি প্রধানমন্ত্রী

হওয়াতে আপত্তিটা কেবল আমার বেলাতেই ? কত লোক যে ইতিমধ্যে বিনা-টেনিং-এ সোজাসুজি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল, কই তখন ত কেউ আপত্তি কয়ে নাই ।

আমি আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম : না, না, দোষ কিছু না। আপত্তি আপনার বেলাতেও করি না। তবে কি না, প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে শুধু আপনের ইচ্ছা থাকলেই ত চলবে না, আইনসভার মেম্বররারও ইচ্ছা থাকতে হবে। মেম্বরার ভোট পাবার কি ব্যবস্থা করছেন ?

ওয়াহেদ মাস্টার পূর্ণ বিশ্বাসের দৃঢ়তা সহকারে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন : মেম্বররার ভোট পাওয়ার ব্যবস্থা আগে করার দরকার কি ? আগে প্রধানমন্ত্রিত্ব, তারপর মেম্বররার ভোট। আজকাল গণতন্ত্রে নতুন নিয়ম চালু হইছে, সে খবর আপনি রাখেন না বুঝি ? একবার প্রধান-মন্ত্রীর গদিতে বসতে পারলে মেম্বররার ভোট আমিও নিশ্চয় পাব।

আমি হাসিয়া বলিলাম : তা পাবেন জানি। কিন্তু আপনারে সে গদিতে বসায় কেটা ?

ওয়াহেদ মাস্টার বিজ্ঞের স্মিত হাসি হাসিয়া বলিলেন : কেন, লাট সাহেবরা। তিনিরাই ত আজকাল যারে খুশী প্রধানমন্ত্রী বানাবার পারেন। বড় লাট বাহাদুর করাচীতে একজন কারে না সেদিন প্রধানমন্ত্রী করলেন ? আমারেই বা তিনি পারবেন না কেন। আমি ত তাঁরই কাছে প্রধান মন্ত্রিত্বের জন্য দরখাস্ত পাঠায়ে দিছি। আপনারে না দেখায়ে ওটা দেওয়া বোধ হয় ঠিক হয় নাই। তাই আপনেরে দেখায়ে আর একটা দরখাস্ত ছোট লাট বাহাদুরের নিকট ঢাকায় পাঠাতে চাই। করাচীতে যদি ভ্যাকেন্সি না থাকে। আমি নিজে একটা মুসাবিদা করছি। আপনে একটু দেখে দেন ত।

—বলিয়া ওয়াহেদ মাস্টার পেন্সিলের লেখা একটি দরখাস্তের মুসাবিদা আমার সামনে টেবিলের উপর রাখিলেন :

তারপর বলিলেন : আপনি এটা একটু তাড়াতাড়ি দেখে রিকমেণ্ড করে দেন। আজকের ডাকেই এটা আমি পোষ্ট করতে চাই।

পেন্‌সিলের-লেখা দরখাস্ত পড়িয়া সময় নষ্ট করিবার মত সময়ও নাই, অথচ তাঁকে রাগাইতে বা তাঁর মনে কষ্ট দিতেও পারি না। কাজেই বলিলাম: লাট সাহেব আপনেরে প্রধানমন্ত্রী করবেন কেমনে? আপনি ত আইনসভার মেম্বর নন।

ওয়াহেদ মাস্টার রাগে সোজা হইয়া বলিলেন: দেখেন উকিল সাব, না-হক বাজে কথা কইয়া আমার সময় নষ্ট ও মেযাজ গরম করবেন না। প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে আগে মেম্বর হতে হবে, এমন ধাপ্পা দিয়া আমারে ভুলাবার পারবেন না? বড়লাট সেদিন যাঁকে করাচীতে প্রধানমন্ত্রী করলেন, তানি কি আগে মেম্বর হইছিলেন? আমার দরখাস্তটার ভাষা-টাষা ঠিক আছে কি না, তাই দেখে দেন। আপনের উপদেশ নিতে আমি আসি নাই।

বুঝিলাম, কঠিন লোকের পাল্লায় পড়িয়াছি। গলা ফসকাইবার আশায় বলিলাম: আচ্ছা এম. এল. এ. না হয় নাই হলেন, কিন্তু টাকাওয়ালা ত হতে হবে। সেদিন করাচীতে যে নন-মেম্বর ভদ্রলোক প্রধানমন্ত্রী হইছেন, তিনি টাকাওয়ালা বড় লোক। আপনার টাকা-কড়ি কি পরিমাণ আছে?

সাপের মাথায় দাওয়াই পড়িল। সিদ্ধ করা শাকের মত মিলাইয়া গিয়া ওয়াহেদ মাস্টার বলিলেন: ঠিক কইছেন ত উকিল সাব। টাকা-কড়ি ত সত্যই আমার নাই। কারণ টাকা-কড়ি করতে হলে কনট্রাক্টর হওয়া চাই, নিদানপক্ষে নুনের পারমিট বা পাটের এজেন্সি চাই। এর একটাও যে আমার নাই।

এইবার ওয়াহেদ মাস্টারকে বেকায়দায় ফেলিয়াছি আশা করিয়া নড়িয়া-চড়িয়া আটসাট হইয়া বসিলাম। বলিলাম: তবে আগে তারই চেষ্টা করুন না কেন?

মাস্টার সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন: উঁহু, ওর একটাও পাবার উপায় নাই। ওসব পেতে হলে আগে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মেম্বর

হওয়া লাগব। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের লোক ছাড়া অন্য কাউকে ও-সব দেওয়া হয় না, তা জানেন না বুঝি ?

আমি হাসিয়া বলিলাম : বেশ ত, আগে জাতীয় প্রতিষ্ঠানেই ঢুকে পড়েন না।

ওয়াহেদ মাস্টার নিরাশা-ব্যঞ্জক সুরে বলিলেন : অনেক চেষ্টা করছি, উকিল সাব, ঢুকবার পারি নাই।

এবার আমি সত্যই বিস্মিত হইলাম। বলিলাম : বলেন কি ? চেষ্টা করেও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ঢুকবার পারেন নাই ? ওটা যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ওটার দরজা শুনি সকলের জন্যই খোলা।

ওয়াহেদ মাস্টার বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন : অমন শুনাই যায়। ইউনাইটেড নেশনসের দরজাও ত সব নেশনের জন্য খোলা, তবু খাট কোটি লোকের দেশ চীন তাতে ঢুকবার পারে না কেন ?

আমি বিস্ময়ে ওয়াহেদ মাস্টারের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিলাম। কে বলে লোকটার মাথা খারাপ ? আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে এমন উক্তি কোন প্যাগলে করিতে পারে ?

আমি বলিলাম : কেন পারে না, মাস্টার সাব ?

ওয়াহেদ মাস্টার বলিলেন : ওটার নাম ইউনাইটেড নেশনস। কাজেই ওতে ঢুকবার যোগ্য হতে হলে আগে ইউনাইটেড হতে হবে। ইউনাইটেড হতে গেলে কারও সাথে ইউনাইটেড হতে হবে ত ? কার সাথে ইউনা-ইটেড ? যারা আগেই ইউনাইটেড হয়ে আছে, স্বভাবতঃই তারার সাথে। চীন দেশ তা পারে নাই, কাজেই চীনদেশ ইউনাইটেড নেশনসে ঢুকবার পারল না। আমরার জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সেই কথা। এক জাতীয় অর্থাৎ দলভুক্ত লোক না হলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে কেউ ঢুকবার পারে না।

আমি একটা কিনারা পাইয়াছি মনে করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম : বেশ তাই যদি সত্য হয়, তবে আপনার প্রধানমন্ত্রী হবারও আশা নাই।

কারণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আস্থা-ভাজন না হলে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না।

ওয়াহেদ মাস্টার টেবিলে থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন: সেই কামই ত আমি করছি। আমি এক ঢিলে দুই পাখী মারবার ফন্দি করছি।

পাগলেও লোকের মনে বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারে। ওয়াহেদ মাস্টারের কথাতেও আমার তাক লাগিয়া গেল।

বলিলাম: এক ঢিলে দুই পাখী? সেটা কেমন?

ওয়াহেদ মাস্টার উপরের ঠোঁট দিয়া নিচের ঠোঁট কামড়াইয়া দৃঢ়তার সংগে বলিলেন: প্রধানমন্ত্রিত্ব, উকিল সাব, ঐ প্রধানমন্ত্রিত্ব। কোনমতে একবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে যদি বসতে পারি, তবে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মেম্বর-গিরি আপেনা-আপনি আসবে। এমন কি, তিন দিনের মধ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হয়ে যাব, মিটিং-এর নোটিসটা দিতে যে-কয় দিন লাগে আর কি?

আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু দম ধরিয়া ওয়াহেদ মাস্টার আবার বলিলেন: কথাটা বুঝলেন না উকিল সাব? জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মেম্বর হয়েও প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, আবার প্রধানমন্ত্রী হয়েও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মেম্বর হতে পারেন। তবে দ্বিতীয় রাস্তাটা প্রথমটার চেয়ে অনেক সোজা যাকে আল্লাহতালার ভাষায় সিরাতুল-মুস্তাকিম বলা হয়। সোজা রাস্তা ফেলে বেঁকা রাস্তায় হাটা বোকামি। তা ছাড়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মেম্বর হলেই প্রধানমন্ত্রিত্বও পাবেনই, তার কোনও নিশ্চয়তা নাই। অথচ প্রধানমন্ত্রী হলেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মেম্বর ত হবেনই, চাই কি একেবারে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হতে পারেন।

আমি অকপট হাসি হাসিয়া বলিলাম: যা দিন-কাল পড়ছে, তাতে পারেন আপনি সবই। কিন্তু পার্টির লীডার না হয়ে আগেই প্রধানমন্ত্রী হওয়া? এটা কি গণতান্ত্রিক হবে?

ওয়াহেদ মাস্টার হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন: ও-সব আপনারার গণতান্ত্রিক মোহ। আমরার ইউনিক কনস্টিটিউশনে ও-সব চলে না।

আমরার দেশে আগে প্রধানমন্ত্রিত্ব, তারপর লীডারশীপ, তারপর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব। সব জাতির, সব দেশেরই এক-একটা নিজস্ব ধারা ও কালচার আছে। সেটাই তারার প্রাণ-শক্তি। আমরার ইউনিক তমদ্দুনই আমরার প্রাণশক্তি।

দেখিলাম, ওয়াহেদ মাস্টারকে তর্কে হারাইয়া বিদায় করিবার উপায় নাই। তাই তাঁর দরখাস্তটা পড়িয়া প্রয়োজন-মত অথবা অন্ততঃ লোক দেখানো সংশোধন করিয়া দিয়াই তাঁকে বিদায় করিতে হইবে।

অতএব দরখাস্ত পড়িতে লাগিলাম

"কেন্দ্রীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে ডিসমিস করার জন্য মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারক-বাদ জানাইয়া যথারীতি ভূমিকা করিবার পর দরখাস্তে লেখা হইয়াছে যে, যে খাদ্য-সংকটের দরুণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ডিসমিস করা হইয়াছে, আমাদের এদেশেও সেই সংকট বিদ্যমান। অতএব মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের পদাংক অনুসরণ করাই পূর্ব বাংলার লাট বাহাদুরের কর্তব্য। ছোট-লাট বাহাদুরের এই কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে গিয়া দরখাস্তে এইরূপ যুক্তি দেওয়া হইয়াছে : মহামান্য বড়লাট বাহা-দুরের কাজে এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমগ্র দেশে খাদ্য-সংকট আছে। পূর্ব-বাংলা সমগ্র দেশেরই অন্তর্গত। অতএব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে পূর্ব-বাংলায়ও খাদ্য-সংকট আছে। এর আগে দেশবাসী এটা বুঝিতে পারে নাই। কারণ যদিও দেশবাসী নিজেরা দেখিতেছে দেশে খাদ্য-সংকট আছে, কিন্তু জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মন্ত্রীরা বলিতে-ছিলেন খাদ্য-সংকট নাই। এই দুই বিপরীত জ্ঞানের মধ্যে একটাতেই মাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। কোন্‌টা বিশ্বাস করিবে দেশবাসী? নিজেরার জ্ঞানে, না মন্ত্রীরার জ্ঞানে? অর্থাৎ মূর্খের জ্ঞানে? না জ্ঞানীর জ্ঞানে? নিজেরার চোখে-দেখা ব্যাপারে দেশবাসী বিশ্বাস করিতে পারে না, কারণ তারা মূর্খ। পক্ষান্তরে মন্ত্রীরার কথায় দেশবাসী অবিশ্বাস করিতে পারে না, কারণ তাঁরা জ্ঞানী এবং তাঁরার প্রতি

৬—

দেশবাসীর গভীর আস্থা রহিয়াছে। মন্ত্রীরার প্রতি দেশবাসীর যে অটুট আস্থা রহিয়াছে, তার অকাট্য প্রমাণ এই যে, মন্ত্রীরা নির্বাচন দেন না।"

এই পর্যন্ত পড়িয়াই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। কারণ আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, পাগলের লেখা পড়িতেছি। তাই পড়া বন্ধ করিয়া আমি বলিলাম: ইলেকশন না দেওয়াটা অটুট আস্থার প্রমাণ হল কিরূপে মাস্টার সাব?

ওয়াহেদ মাস্টার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন: সম্পাদকতা ছেড়ে দিছেন বলে কি আপনি রাগে খবরের কাগয পড়াও ছেড়ে দিছেন? দেখেন নাই কি আমরার প্রধানমন্ত্রী ইলেকশন দাবির জবাবে কতবার ঘোষণা করছেন: ইলেকশন হলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান শতকরা একশটি সীটই দখল করবে, কারণ দেশবাসী অন্তরে-অন্তরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পিছনেই আছে?

আমি বলিলাম: হাঁ, ওটা আমি পড়ছি। আমরার প্রধানমন্ত্রী ও-কথা বলছেন ঠিকই। কিন্তু তাতে হইছে কি? অমন কথা ত সব দলের নেতারাই কইয়া থাকেন।

ওয়াহেদ মাস্টার আমার দিকে চোখ গরম করিয়া বলিলেন: আর সব দলের সাথে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনা করবেন না। জাতীয় প্রতিষ্ঠানই এখন ক্ষমতায় আসীন। ইলেকশন করা-না-করাটা তাঁরারই দায়িত্ব। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিচারও তাঁরাই করবেন। যতদিন তাঁরা স্পষ্টই দেখতেছেন যে, নির্বাচন হলে তাঁরাই আবার নির্বাচিত হবেন, ততদিন কেন খামাখা নির্বাচন দিয়া রাষ্ট্রের তহবিলের অপচয় করবেন? জনগণের তহবিল নিয়া তাঁরা ত আর ছিনিমিনি খেলতে পারেন না।

ওয়াহেদ মাস্টারের যুক্তি আমি মানিতে পারিলাম না। বলিলাম: জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় নেতারার উপর জাতির অটুট আস্থা যদি থেকেও থাকে, তবু গণতন্ত্রের খাতিরে নির্ধারিত ম্যাদ মধ্যে ইলেকশন দেওয়া উচিত।

ওয়াহেদ মাস্টার সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন: কেন দেওয়া উচিত? সুস্পষ্ট সত্যকে পয়সা খরচ করে পরখ করতে হবে? সুরুজ

উঠছে কি না, হারিকেন আলায়ে তা দেখতে হবে ? আমার প্রতি আমার স্ত্রীর আনুগত্য আছে কি না, সেটা তার ভোট নিয়া বুঝতে হবে ? তার ব্যবহারই কি যথেষ্ট নয় ? অতএব আমার মতে যতদিন মন্ত্রীরা না বুঝবেন যে ইলেকশন হলে তার ফলে একটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে, ততদিন ইলেকশন দিয়া পয়সা খরচ করা উচিত না।

আমি পরাজয় মানিলাম। বলিলাম : মাস্টার সাহেব, আমি স্বীকার করি আপনি প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য। এটাও আমি স্বীকার করি, কোনো মতে প্রধানমন্ত্রী হতে পারলে আপনি গদি টিকায়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারতেছি না।

ওয়াহেদ মাস্টার নিজের নিশ্চিত জয়ের গৌরবে মুখ উজ্জল করিয়া বলিলেন : বলেন, কোন্টা বুঝতে পারতেছেন না। এক কথায় পানির মত বুঝায়ে দিব।

সত্যই যেন কোনো সুস্থ মানুষের সাথে তর্ক করিতেছি এমনি ভাবে আমি বলিলাম : আপনি আপনার দরখাস্তে লাট সাহেবকে লিখেছেন যে, আপনারে প্রধানমন্ত্রী করা মাত্র আপনি দেশের খাদ্য-সংকট দূর করবেন। সেটা সত্যই পারবেন ? আপনি খাদ্য-সংকট দূর করবেন কেমনে ? রেংগুন হতে চাউল আমদানি করে ? না, 'গ্রো মোর ফুড' করে ?

ওয়াহেদ মাস্টার তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন : আপনার 'ফুড কনফারেন্স' বড় গলায় ত 'গ্রো মোড় ফুডের' মোটা মোটা স্কীম দিছিলেন। কোন্ ফলটা হল তাতে ? কোন উপকার হল দেশের ? খৃস্টানী শিক্ষায় কুশিক্ষিত আপনারা, ওসব নাসারাই স্কীমে আপনারাই বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু আমরা মুসলমান। আমরা পাকিস্তানী। জানেন, পাকিস্তান আমরা হাসিল করছি কিসের লাগি ? নাস্তিক, পেট-পূজারী, ইহকাল-সর্বস্ব বিভ্রান্ত বিশ্বজগতকে ইউনিক আদর্শ দেখাবার লাগি। আমরার রাষ্ট্র ইউনিক ; আমরার কনষ্টিটিউশন ইউনিক ; আমরার গণ-পরিষদ ইউনিক ; আমরার আইন সভা ইউনিক ; আমরার ব্যবসা-বাণিজ্য ইউনিক ; আমরার অর্থনীতি ইউনিক ; আমরার—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম : থামেন থামেন মাস্টার সাব। আমরার সবই ইউনিক, এটা বুঝলাম। কিন্তু ইউনিক অর্থনীতিটা কি, তা ত বুঝলাম না।

ওয়াহেদ মাস্টার বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিলেন : শুভংকরী, উকিল সাব, শুভংকরী। শুভংকরী মনে নাই? "শুভংকরের ফাঁকি, তিরিশ থেকে তিনশ গেল, কত রইল বাকি?" কিছু বুঝতে পারলেন? আমরার দেশের সরকার রেংগুন হতে ছয় টাকা মণ দরে চাউল কিনে এনে কনসেশন দামে আঠার টাকা মণ দরে এদেশে বিক্রয় করলেন। কত লোকসান হল বলতে পারেন?

আমি তাজ্জব হইয়া বলিলাম : লোকসান হবে কেন? মণকরা বার টাকা লাভ হল ত।

ওয়াহেদ মাস্টার হো-হো করিয়া আমার বৈঠকখানার ছাদ ফাটাইলেন। বলিলেন : না না লাভ হয় নাই। একত্রিশ লাখ টাকা লোকসান হইছে। সিভিল সাপ্লাই দফতরের মন্ত্রীর বক্তৃতা পড়ছেন না : দিস ডিপার্টমেন্ট ইয্ রানিং এ্যাট এ লস?

আমি বুঝিলাম লোকটার মাথা খারাপ হইলেও খবরের কাগয পড়েন এবং মনেও রাখিতে পারেন। বলিলাম : মন্ত্রী সাবের এ কথার অন্য অর্থও ত হতে পারে?

ওয়াহেদ মাস্টার খুশী হইয়া বলিলেন : এইবার পথে আসেন। আমিও ত এতক্ষণ এই কথাই বলতেছি। সব কথারই দুই রকম অর্থ হবার পারে। যেমন ডিভ্যালুয়েশন ও নন-ডিভ্যালুয়েশন। এতে টাকার দাম বাড়াও বোঝায়, কমাও বোঝায়। কাগযে-কলমে আমরার একশ টাকার দাম হিন্দুস্তানী টাকায় একশ চুয়াল্লিশ টাকা; আবার বাজারে দেখবেন আমরার একশ টাকা হিন্দুস্তানী আশি টাকা।

ওয়াহেদ মাস্টার ক্রমেই দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া আমি তাঁকে থামাইবার উদ্দেশ্যে বলিলাম : এ রকম উল্টা-পাল্টা হওয়ার কারণ কি?

ওয়াহেদ মাস্টার সত্য-সত্যই মাস্টারী মেযাজ করিয়া বলিলেন : এটাই ত আমরার ইউনিক অর্থনীতি। আমরার অর্থনীতির মূলনীতি হচ্ছে ত্যাগ, স্যাক্রিফাইস, তর্কে-দুনিয়া, আখের ফানা। লাভেই লোভ বাড়ে। লোভেই দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে। কাজেই আমরার ইউনিক অর্থনীতিতে কোনো লাভের হিসাব থাকবে না। শুধু থাকবে লোকসানের হিসাব। কারণ সবই আখের ফানা ; দুনিয়াটা কিছু না— আদ্‌, দুনিয়া শাজারাতেশ্‌, শয়তান। ধরুন, জুট-বোর্ডের পাট বিক্রয়। বাজারে যখন পাটের দর কুড়ি টাকা তখন জুটবোর্ড ত্রিশ লক্ষ মণ (কেউ বলে পঞ্চাশ লক্ষ) পাট তের টাকা দরে বিক্রয় করলেন। মূর্খ লোকেরা এই কারবারের স্পিরিচুয়াল দিকটা ধরতে পারল না বলে হৈ চৈ করতেছে, আর বলতেছে : আমরার অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেল। লাভ লোকসানের সেই সনাতন ভ্রান্ত খৃস্টানী হিসাব। মূর্খেরা বুঝল না যে, অন্যান্য দেশ খরিদ্দার বাড়াবার লাগি মুদ্রা-মূল্য কমায়। আমরা ইউনিক জাতি। আমরা ত আর অমুসলমানরার অনুকরণ করতে পারি না। তাই আমরা খরিদ্দার বাড়াবার জন্য মুদ্রা কমাই; মূল্য অর্থাৎ ইয্‌যত কমাই না। ইয্‌যতটাই আমরার বড় কথা। মুদ্রা অর্থাৎ টাকাটা আমরার বড় কথা নয়, ওটা ত হাতের ময়লা।

কথাটা বুঝিতে পারিলাম না, অথচ নিছক পাগলামি বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। তাই বলিলাম : মুদ্রা-মূল্য না কমায়ে মুদ্রা কমানটা কেমন, এটা বুঝলাম না মাস্টার সাব।

ওয়াহেদ মাস্টার শ্রেষ্ঠত্বের স্মিত হাসি হাসিয়া বলিলেন : একে ত ইকনমিক্‌স সাবজেক্টটাই কঠিন, তার উপর ইউনিক হলে আরও কঠিন হয়। কাজেই একচোটে বুঝতে আপনার কষ্ট হবেই। ব্যাপারটা হচ্ছে এই : হিন্দুস্তানীদেরে আমরা বললাম : 'আমরার টাকা তোমরার টাকার দেড়া, মানবা কিনা বল'। না মানলে তোমরার সাথে আমরার কোন কার-কারবার নাই।' হিন্দুস্তানীরা কইল : 'আপনেরা যখন বললেন দেড়া, আমরা কি না মেনে পারি ? নিশ্চয় মানলাম। তবে আপনারা

মুসলমান বাদশার জাত; আর আমরা হলাম গরিব মানুষ বামুন-কায়েতের জাত; দেড়টাকা দিতে পারব না, বার আনা দিব। বাকী বার আনা আমরা মাফ চাই।' হিন্দুরা আমরারে বাদশার জাত কইছে, আর চাই কি? দিয়া দাও মাফ বার আনা। তাই হিন্দুস্তানী বার আনা দিলেই পাকিস্তানী এক টাকা পাওয়া যায়। এখন বুঝলেন? আমরার টাকার দাম ঠিকই থাকল, ওরা বার আনা মাফ চেয়ে নিল মাত্র।

লোকটাকে ঠিক পাগল ধরিয়া নিতে পারিলাম না। বরঞ্চ তাঁর যুক্তিতে আকৃষ্ট হইলাম। অবশ্য মাঝে-মাঝে মনে হইতে লাগিল: আমিও শেষে পাগল হইয়া যাইতেছি নাকি?

তবু প্রশ্ন করিলাম: সবারই যদি লোকসান হৈতেছে, তবে দেড় হাজার টাকা মাইনার কোন কোন মন্ত্রী দুই তিন বৎসর মন্ত্রিত্ব করেই পাঁচ লাখ টাকার বাড়ি তৈয়ার করছেন কেমন করে? কোন-কোন খবরের কাগযের মালিক আগাগোড়া লোকসান দিয়ে সরকারী গ্র্যাণ্টে কোন রকমে কাগয টিকায়ে রেখে স্বাস্থ্য-নিবাসে প্রাসাদ করছেন কি করে? দেড়শ টাকা মাইনার দারোগা রাজধানীতে লাখ টাকার বাড়ি কিনতেছে কি দিয়ে?

ওয়াহেদ মাস্টার বিরক্ত হইয়া বলিলেন: না। আপনারে বুঝান আমার কর্ম নয়। আরে সাব এতক্ষণ তবে আপনারে কইলাম কি? গণনার সনাতন খৃস্টানী প্রথা আমরার ইউনিক রাষ্ট্রে চলবে না। ওটা আমরা বর্জন করছি। ধরুন, আমরার জুট-বোর্ড পাট বিক্রয় করল: তের টাকা, চৌদ্দ টাকা, পনর টাকা, ষোল টাকা ও সতর টাকা মণ দরে। বলুন ত গড় পড়তা কতটাকা মণ দরে পাট বিক্রয় হল?

আমি বিনা চিন্তায় বলিলাম: হবে তের হতে সতর টাকার মাঝামাঝি একটা সংখ্যা।

ওয়াহেদ মাস্টার হো হো করিয়া হাসিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন: উঁহু, বলতে পারলেন না। আসলে পড়তা পড়ল আঠার টাকা। বিশ্বাস না হয় জুট-বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাম্প্রতিক বিবৃতি পড়ে দেখুন। বলি নাই আপনারে এটা শুভংকরের দেশ?

আমাকে স্বীকার করিতেই হইল ওয়াহেদ মাস্টারের অর্থনীতি নির্ভুল ও ত্রুটিহীন। বলিলামঃ আপনার অর্থনীতি সত্যই ইউনিক। কিন্তু এতে দেশের খাদ্য-সংকট দূর হবে কি করে ?

ওয়াহেদ মাস্টার বিনা দ্বিধায় বলিলেনঃ কেন ? আমরার ইউনিক সমাজতন্ত্রের দ্বারা।

আমি চোখ কপালে তুলিয়া বলিলামঃ আপনার সমাজতন্ত্রও ইউনিক নাকি ? সেটা আবার কি ?

ওয়াহেদ মাস্টার প্রত্যেক সিলেবলে জোর দিয়া ইংরাজী বলিলেনঃ সার টেইন্‌লী। সমাজতন্ত্রের মূলকথা হল ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। আপনার 'ফুড কনফারেন্সে' কাপড় অনুযায়ী কোট কাটার নীতির আপনি ভুল ব্যাখ্যা করছেন। ওতে আপনি লেখছেনঃ খানেওয়ালার সংখ্যা দিয়াও খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করা যায়, আবার খাদ্যের পরিমাণ দিয়াও খানেওয়ালার সংখ্যা ঠিক করা যায়, আপনার এই ব্যাখ্যা আমি মানি না। কারণ ওটা ক্যাপিটালিস্টিক সোশ্যালিযম। ওতে ইন্‌সাফ নাই। সুতরাং ওটা অনইসলামিক। আমরার ইউনিক সোশ্যালিযমে খাদ্য বা খানেওয়ালা কাকেও ডিস্টার্ব করা হবে না। আমরা শুধু খাদ্যাভাবের ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন নিয়াই সন্তুষ্ট থাকব। খাদ্যাভাব অর্থাৎ দুর্ভিক্ষটাও আমরার দেশের একটা সম্পদ—পাটের মতই বড় সম্পদ। উভয় সম্পদের দ্বারাই কারো সর্বনাশ আর কারো ভাদ্র মাস হতেছে।

আমি বাধা দিয়া বলিলামঃ পাটের দ্বারা কারও সর্বনাশ কারো ভাদ্রমাস হতেছে, এটা মানলাম। কিন্তু দুর্ভিক্ষে ত সবারই সর্বনাশ হওয়ার কথা, তাতে আবার কারও ভাদ্রমাস হয় নাকি ?

ওয়াহেদ মাস্টার উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেনঃ দুর্ভিক্ষের ব্যবসাতে অনেক রিলিফ কর্মী জন-সেবক ও খাদিমুল-ইনসানের ভাদ্রমাস হওয়ার ব্যাপার আপনি দেখেন নাই বুঝি ? যা হোক আমরার ইউনিক সোশ্যালিযমের নীতি হবে দুর্ভিক্ষ-সম্পদকে দেশের সর্বত্র ইকুয়ালী ডিস্ট্রি-বিউট করা। ইংরাজ আমলে দেশের এক জায়গায় দুর্ভিক্ষ হত, দশ

জায়গায় হত না। এটা ছিল অন্যায় ও পক্ষপাতমূলক। তাই আমরার কাজ হবে সর্বাগ্রে এই পক্ষপাতমূলক সাম্রাজ্যবাদী ডিভাইড এণ্ড রুল নীতির অবসান। আমরার নীতি হবে সমস্ত বৈষম্য দূর করা। এক জায়গায় দুর্ভিক্ষ হবে, আরেক জায়গায় হবে না, মুসলমান হয়ে এমন বৈষম্য ও অসাম্য আমরা কিছুতেই বরদাশত করতে পারি না।

আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া ওয়াহেদ মাস্টারের সহিত সজোরে মুসাফিহা করিলাম। বলিলাম: আপনি প্রধানমন্ত্রী হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং দেশের খাদ্য-সংকটও আপনার হাতেই দূর হবে। দরখাস্তের কোনো দরকার নাই। আপনি এই ট্রেনেই রাজধানী চলে যান। কালই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিল মিটিং।

o o o

ওয়াহেদ মাস্টার আর আমার সাথে দেখা করেন নাই। রাজধানী হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর পাঠাইয়াছেন: রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর যে ইয্যত তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী হইবার শখ তাঁর চিরতরে মিটিয়া গিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

চেঞ্জ-অব-হার্ট

১

আইন সভার নির্বাচনের মওসুম পড়িয়াছে। ক্যানডিডেটের ভিড় লাগিয়াছে। চাকুরিয়া চাকুরি ছাড়িয়া, উকিল উকালতি ছাড়িয়া, মাস্টার মাস্টারি ছাড়িয়া, দোকানদার ব্যবসায় ছাড়িয়া, পীর সাহেব পীরগিরি ছাড়িয়া, এমন কি মেয়েরা গিন্নিপনা ছাড়িয়া, আইন সভার মেম্বরির দরখাস্ত করিতেছেন। গরু মরিলে আসমানে যেমন শকুনের ভিড় হয়, শহরের রাস্তাঘাটে ক্যানডিডেটের ভিড় হইয়াছে ঠিক তেমনি। কালীপূজার কালীবাড়ির সামনে এবং উরসে-কুলে পীরের দরগায় যেমন ভিড় লাগে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অফিসের দরজায় তেমনি ভিড় লাগিয়াছে। ভক্তবৃন্দের নযরানা গ্রহণের জন্য কালীবাড়ির পুরোহিতরা এবং খানকা শরিফের খলিফারা যেমন ঘষা-মাজা পিতলের খাঞ্চা পাতিয়া বসিয়া থাকেন, কংগ্রেস ও লীগের অফিস-কর্তারাও তেমনি প্রার্থীদের দরখাস্ত ও নযরানা গ্রহণের জন্য টেবিল পাতিয়া বসিয়া আছেন। অদূরে হিন্দু-সভা ও কৃষক-প্রজাওয়ালারাও ফুটপাথে গামছা পাতিয়া বসিয়া আছেন। 'মেট্রো'-'লাইটহাউসে'র টিকিট না পাইলে হতাশ দর্শনার্থীরা অগত্যা যেমন 'রিগ্যাল' ও 'টাইগারে'র টিকিট কিনিয়া থাকেন, তেমনি কংগ্রেস ও লীগের টিকিটপ্রার্থীদের কেউ কেউ বেগতিক দেখিয়া অগত্যা হিন্দুসভা ও কৃষক-প্রজার গামছাতেই নযরানা ও দরখাস্ত ফেলিতেছেন।

২

এমন সময় আমাদের নযির মিঞা খবরের কাগযে এক বিবৃতি দিয়া বসিল। সে মুসলিম জাতির এই সংকট সময়ে নিজেকে জাতির সেবায়

কোরবানি করিবার জন্য চাকুরি ছাড়িয়া দিল। দেশময় চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। চারদিকে ধন্য ধন্য আওয়াজ উঠিল।

নযির মিঞার বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবদের ভিড় হইল। সকলে সবিস্ময়ে বলিল: এ কি করলে তুমি নযির মিঞা? চার শো টাকা মাহিয়ানার চাকুরিটা এমন হেলায় ছেড়ে দিলে?

নযির মিঞা চোখ বড় করিয়া বলিল: মুসলিম জাতির এই সংকটের সময় যদি আমি নিজের স্বার্থের জন্য চাকুরি ধরে বসে থাকি, ইস্‌লাম ও মুসলিম জাতীর সেবায় নিজেকে বিলায়ে যদি না দিই, তবে আখেরাতে আল্লার কাছে কি জবাব দিব?

বন্ধুরা অধিকাংশই কেরানি। তারা নযির মিঞার এসব কথা ভাল বুঝিল না। বলিল: মুসলিম জাতির কি এমন সংকট হয়েছে, যার জন্য তোমার চাকুরিটা ছেড়ে দিতে হল?

নযির বলিল: আশ্চর্য। এটাও তোমরা জান না? পাকিস্তান ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে যে। এ লড়াইয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয হয়েছে পাকিস্তানের সমর্থন করা। কোনো মুসলমানের অবহেলায় যদি অখণ্ড হিন্দুস্থান হয়ে যায়, তবে দেশে মুসলমান ও ইসলামের নাম-নিশানা থাকবে না।

বন্ধুরা শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সকলেই ছা-পোষা বিষয়ী লোক। তারা চিন্তিত হইয়া বলিল: কিন্তু ভাই, চাকুরি ছেড়ে তুমি খাবে কি করে? ছেলে-পেলে রয়েছে যে।

নযির হাসিয়া বলিল: সেটা ঠিক না করেই কি আমি চাকুরি ছেড়ে দিয়েছি ভেবেছ? অত আহাম্মক আমি নই, বন্ধুগণ। আমি ঠিক করেছি আইন সভার মেম্বর হব।

বন্ধুরা এবার আশ্বস্ত হইল। বেতন-টেতনে এবং মন্ত্রী-সংকটের সুযোগ-টুযোগে আইন সভার মেম্বরদের আয় যে মাসে চার শো টাকার অনেক বেশী, এ বিষয়ে অনেক গল্পই বন্ধুদের শোনা ছিল। কাজেই তারা হাসিমুখে বলিল: তাই বল। ওটা পেলে ত ভালই হয়।

কিন্তু আইন সভার মেম্বর হব বললেই ত হওয়া যায় না। পার্টি টিকিট চাই। পার্টির মধ্যে আবার লীগের টিকিট হলেই সবচেয়ে ভাল হয়।

নযির মিঞা এক রকম নিশ্চিত সুরেই বলিল : আমি লীগের টিকিটই নিব ঠিক করেছি।

বন্ধুরা নযির মিঞাকে অনেক সময় লীগ-নেতাদের নিন্দা করিতে এবং পাকিস্তান-প্রস্তাবকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে শুনিয়াছে। 'জাতীয়তাবাদী' অনেক কংগ্রেসী বন্ধুর আড্ডাও তারা নযির মিঞার বাড়িতে হইতে দেখিয়াছে।

কাজেই ব্যাপারটা ঘুরালো ও অনিশ্চিত মনে করিয়া বন্ধুরা বলিল : কিন্তু তুমি ঠিক করলেই ত হল না। লীগ-নেতারা তোমাকে লীগ-টিকিট দিবে কেন? তারা ত জানে, তুমি পাকিস্তানের ঘোর বিরোধী।

নযির মিঞা সোৎসাহে বলিল : ছিলাম একদিন, কিন্তু এখন আমার চেঞ্জ-অব-হার্ট হয়েছে।

সন্দেহবশে বন্ধুরা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল : তোমার অন্তরের পরিবর্তন হয়ে থাকলেও সেটা এতই নতুন ও সাম্প্রতিক যে, লীগ-নেতারা সেটা বিশ্বাস নাও করতে পারেন ত?

অসহিষ্ণু সুরে নযির মিঞা বলিল : আহ্। তোমরা কিছু জান না দেখছি। এই সেদিন কায়েদ-ই-আযম জিন্না এলান করেছেন যে, চেঞ্জ-অব-হার্ট হলে যে কোন মতের মুসলমান মুসলিম লীগে যোগ দিতে পারে।

কায়েদ-ই-আযম? বন্ধুদের মনে পড়িল জিন্না সাহেবকে এই নযির মিঞা কতই না গাল দিয়াছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর এজেন্ট বলিয়া। হঠাৎ এত পরিবর্তন?

তারা বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিল : কি হল তোমার, নযির মিঞা? সত্যই কি এটা সম্ভব?

নযির মিঞা নিরুদ্বেগে বলিল : কেন সম্ভব নয়? এ যে চেঞ্জ-অব-হার্টের ব্যাপার। তাছাড়া আমি ত আর সত্য-সত্যই জিন্না সাহেবের

ও পাকিস্তানের বিরোধী কখনো ছিলাম না। হক সাহেবের প্রগ্রেসিভ মন্ত্রিসভা আমাকে এই চাকুরিটা দিয়েছিল বলেই ওদের খুশী করবার জন্য আমি মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের নিন্দা করতে বাধ্য হতাম। মনে-মনে কিন্তু আমি বরাবরই মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের সমর্থক ছিলাম।

এবার বন্ধুরা বিশ্বাস করিল। বেচারারা হিন্দু বড়বাবুদের অধীনে কেরানিগিরি করে। বড়বাবুদের মুসলিম-প্রীতির আতিশয্য চোখ বুজিয়া বরদাশত করিয়াই তারা কোনো মতে চাকুরি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এতে তারা প্রায় সকলেই মনে-মনে প্রবল হিন্দু-বিরোধী ও মুসলিম লীগ সমর্থক হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কোনো দিন মুখ ফুটিয়া তা বলে নাই। বরঞ্চ বড়বাবুদেরে খুশী করিবার জন্য মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার কতই না নিন্দা করিয়াছে। কাজেই নযির মিঞার কথার মধ্যে তারা নিজেদের অন্তরের প্রতিধ্বনি পাইল।

নযির মিঞার পাকিস্তান-প্রীতির সরলতায় বিশ্বাস করিয়া এবং তার লীগ টিকিট পাওয়ার জন্য আল্লার দরগায় দোওয়া করিয়া বন্ধুরা বিদায় হইল।

৩

বন্ধুদেরে যত সহজে বুঝ দিতে পারিল, নযির মিঞা নিজের স্ত্রীকে কিন্তু অত সহজে পটাইতে পারিল না।

স্বামীর চাকুরি ছাড়ার গুজব প্রতিবেশী মহলে সে আগেই শুনিয়াছিল। স্বামীর চাকুরি ছাড়ার বা যাওয়ার সম্ভাবনায় কোন্ সতী নারী চিন্তাযুক্ত না হইয়া পারে? বন্ধু-বান্ধবের সাথে বৈঠকখানায় স্বামীর কথাবার্তা সে তাই প্রবল আগ্রহে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছে। কিন্তু স্বামীর কথায় তার মন প্রবোধ মানে নাই।

তাই বন্ধু-বান্ধবকে বিদায় দিয়া বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া নযির মিঞা ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র বিবি সাহেবা ওৎ পাতা নেকড়ের মত নযির মিঞার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।

কামড়াইল না। তৎপরিবর্তে তার সামনে আলুথালু হইয়া পড়িয়া 'হায় আমার কি হল গো' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মা মরার খবর পাইলে যেরূপ কাঁদিতে হয় এটা সেইরূপ কান্না। মেয়েলোক যে সুরে কাঁদে সেই সুর।

নযির মিঞা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কৌতুহলী প্রতিবেশী মেয়েরা জানালা খুলিয়া উকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। নযির মিঞা ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বিবিকে সান্ত্বনা দিতে বসিল। চোখের পানি মুছাইয়া দিল, আদর করিল, ছেলেমেয়েরা জাগিয়া উঠিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, ধমকাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কান্না থামিল না।

অগত্যা শেষ পন্থা হিসাবে নযির মিঞা রাগিয়া গেল। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়া স্ত্রীর এই হৃদয়হীনতায় মর্মাহত হইয়াছে বলিয়া সে যখন মনের দুঃখ প্রকাশ করিল এবং 'থাক তোমার কান্না নিয়া, আমি খালি পেটেবাড়ি ছেড়ে চললাম'—বলিয়া সে যখন সত্য-সত্যই একসংগে পিরহান গায়ে ও জুতা পায়ে দিতে লাগিয়া গেল, তখন বিবি সাহেবা মোটরের ব্রেক চাপার মত অকস্মাৎ কান্না থামাইয়া নযির মিঞার হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল: এই যে আমি কান্না থামলাম। আল্লার দোয়াই, আপনি যাবেন না, আমি খানা আনছি।

অত রাত্রে সত্য সত্যই কোথাও যাইবার ইচ্ছা বা স্থান নযির মিঞার ছিল না। অতএব বিছানার পাশে বসিয়া পড়িল। বিবি তাড়াতাড়ি খানা আনিতে গেল।

খানা আনিতে-আনিতে বিবি অনেকটা শান্ত হইল। পাশে বসিয়া ভাত-তরকারি দিতে-দিতে সে বলিল: এত বড় চাকুরিটা ছেড়ে দিলেন, কেমনে চলবে আমাদের এখন? ছেলেমেয়ের মুখে কি দিব আমি?

নযির মিঞা কাশিয়া গলা সাফ করিয়া বলিল: কেন চিন্তা করছ বিবি? আইন সভার মেম্বর হতে যাচ্ছি যে।

বিবি: মেম্বরগিরিতে মাইনা কত?

নযির: আড়াই শো।

বিবি আবার হায় হায় করিয়া কান্না জুড়িবার আয়োজন করিতেছে দেখিয়া নযির মিঞা তাড়াতাড়ি বলিল: এ ছাড়া টি এ আছে, ডি-এ আছে। আরো কত কি?

বিবি: সব মিলায়ে মাসে কত পাবেন?

নযির: তা চার পাঁচ শো ত হবেই।

বিবি: চার শো ত এই চাকুরিতেই পাচ্ছিলেন? তবে আর কি লাভটা হল?

নযির: লাভটা কি তোমার চোখে পড়ে না? লাভ না হলে প্রার্থীর অত ভিড় হয় কেন? তোমাদের পাড়ার মোক্তার সাহেব ও আমাদের পাশের বাড়ির মুন্সী সাহেব যে পাচ বছর মেম্বরি করে দুতলা দালান করেছে, শতাধিক বিঘা জমি কিনেছে, এ ছাড়া হাজার হাজার টাকা ব্যাংকে জমা করেছে, এ সব কি তুমি দেখ নাই?

বিবি সাহেবা সবই দেখিয়াছে। কিন্তু ওদের নিন্দাও শুনিয়াছে প্রচুর। তাই বলিল: ওসব টাকা নাকি নাহক নাজায়েয টাকা?

নযির মিঞা ধমকাইয়া বলিল: আরে রাখ। টাকা আবার নাহক নাজায়েয।

বিবি: হ্যাঁ, আমি শুনেছি ওসব নাকি ঘুষের টাকা।

নযির: ঘুষ আবার কি? মন্ত্রি-সভা ভাংগা-গড়ার ব্যাপারে ওসব টাকা দেনা-পাওনা হয়েই থাকে।

বিবি: কেন?

নযির: কেন আবার কি? মন্ত্রীরা মাসে তিন চার হাজার টাকা মাইনের চাকুরি পাবে, যারা ভোট দিয়ে তাদেরে ঐ চাকুরি পাইয়ে দিবে তারা ঐ মাইনের কিছু অংশ টংশ পাবে না?

এতক্ষণে বিবি সাহেবা ব্যাপারটা বুঝিল। বলিল: ওঃ, এই জন্য মন্ত্রীরা মেম্বরদেরে টাকা দেয়? তবে ত ওটাকা হালালই বটে।

নযির: হালাল বলতে হালাল? হালালের দাদা। তার বাদে শুধুই কি টাকা? কন্ট্রাক্টরি আছে, আত্মীয়-স্বজনের চাকুরি আছে

ডিসিক্ট বোর্ডের নমিনেশন আছে। আরো কত কি। তুমি মেয়ে মানুষ, অতসব বুঝবে না।

বিবি: তবু আমার ভাল লাগছে না। এমন বাঁধা-ধরা চাকুরিটা। মাসের শেষে কড়কড়া টাকা। কোন চিন্তা-ভাবনার বালাই নেই। মেম্বরগিরির আয়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ওতে আমার মন চলে না। চাকুরিটা ফিরে পাবার কোন উপায় নাই?

নযির: তুমি কোন ভাবনা করো না বিবি। নিজে ত হাজার-হাজার টাকা রোযগার করবই, তার উপর তোমার ছোট ভাই নুরুটা ম্যাট্রিক পাশ করলেই তাকে সাব-রেজিস্ট্রারি অথবা দারোগাগিরি নিয়ে দিব। তাছাড়া কত মাড়ওয়ারী তোমার জন্য গহনা ও শাড়ি নিয়ে আমার দরজায় ধন্না দিবে।

এবার বিবি শান্ত হইল। তার মুখে হাসি ফুটিল। বলিল: তবে মেম্বরই হোন।

৪

যথাসময়ে নযির মিঞা মুসলিম লীগে দরখাস্ত ও নযরানা দাখিল করিল। লীগ-নেতারা খবরের কাগযে নযির মিঞার বিবৃতি পড়িয়া-ছিলেন। সুতরাং এক রকম ভরসা দিয়াই তাঁরা নযির মিঞার দরখাস্ত গ্রহণ করিলেন।

লীগ টিকিট পাওয়া সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিত হইয়া নযির মিঞা এলাকায় চলিয়া গেল। সেখানে পাকিস্তানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে তার বক্তৃতায় বলিল: দীর্ঘ দিন দিবারাত্র চিন্তা করে বহু বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে, হিন্দুদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে, সে এই নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, পাকিস্তানই মুসলমানদের মুক্তির একমাত্র পথ, আর মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমবেত জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করিল এবং করতালি দিল।

যথাসময়ে লীগ নমিনেশনের দিন ঘনাইয়া আসায় নযির মিঞা শহরে ফিরিয়া আসিল।

নির্ধারিত সময়ে মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠক বসিল। নযির মিঞা ও অন্যান্য সকল প্রার্থীই হাযির হইল। নযির মিঞার এলাকার আরো দু একজন প্রার্থী লীগ-টিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। একে-একে সবারই ডাক হইল। শেষে নযির মিঞারও ডাক পড়িল। ঢুকিবার আগেই সে দেখিয়াছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা একে-একে মুখ কালো করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। টিকিট সম্বন্ধে নযির মিঞা আরো নিশ্চিত হইয়াছিল।

ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল নেতারা সারি বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। সে অতি ভক্তি দেখাইবার জন্য একে একে সবাইকে পৃথক-পৃথক আদাব দিল। নেতারা হাসিলেন।

একজন, মেম্বরদের মধ্যে প্রধান ও মিটিং এর সভাপতিই হইবেন, নযির মিঞার নাম-ধামাদি যথারীতি জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিলেন: দেখুন মিঃ নযির, আপনি পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন?

নযির সোৎসাহে বলিল: নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

নেতা: বুঝে-সুঝে বিশ্বাস করেন, না কেবল লীগ টিকিট পাবার জন্যই বিশ্বাস করেন? আপনি নাকি আগে পাকিস্তান-বিরোধী ছিলেন? সত্যই কি আপনার চেঞ্জ অব-হার্ট হয়েছে এখন?

নযির: জি হাঁ। হয়েছে। আমি এখন অন্তর দিয়েই এবং বুঝে-সুঝেই পাকিস্তানে বিশ্বাস করি। আমি বহু স্টাডি ও অনেক চিন্তা করে কন্‌ভিন্‌স্‌ড হয়েছি যে, পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানদের বাঁচবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই।

নেতা: বেশ বেশ। আর দেখুন, আপনি কি মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে মানেন?

নযির: নিশ্চয় মানি, এক শো বার মানি।

নেতা : লীগের বিরুদ্ধে যাওয়া কোন মুসলমানের উচিত নয়, এটা আপনি মানেন ?

নযির : হাজার বার মানি।

নেতা : বেশ, শুনে আমরা নিশ্চিত হলাম। আপনার লীগ-ভক্তিতে আমরা খুবই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। কিন্তু আমরা দুঃখের সংগে আপনাকে জানাচ্ছি যে, এবারকার নির্বাচনে লীগ-টিকিট আপনাকে দিতে পারলাম না, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী খোন্দকার সাহেবকেই দিলাম। আশা করি আপনি এলাকায় গিয়ে খোন্দকার সাহেবের পক্ষে ওয়ার্ক করে তাঁকে জিতিয়ে দিবেন। ইন্‌শা-আল্লাহ্, আগামী নির্বাচনে আপনার কথা আমাদের মনে থাকবে। এইবার আপনি এই উইথড্রয়াল পিটিশনটায় দস্তখত করে নির্বাচন হতে সরে দাঁড়ান।

নযির মিঞা স্তম্ভিত হইল। সহসা তার মুখে কথা সরিল না। মুহূর্তে তার এতদিনকার সমস্ত সুখ-স্বপ্ন তাসের ঘরের মত ভাংগিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কল্পনায় রচিত দালান-কোঠা, মোটর গাড়ি, বিবির শাড়ি-গহনা সবই হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সবই কি তবে মিথ্যা হইবে? বেটা বদমায়েশ লীগ-নেতারা এমন করিয়া তার মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিতে চায়? নিতে কি এরা পারে?

এলাকার বিরাট সভাসমূহের বিপুল জনতার হর্ষধ্বনি ও করতালি তার চোখের সামনে বায়স্কোপের ছবির মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারা ত সবাই নযিরকেই ভোট দিবে বলিয়াছে। তবে লীগ-নেতারা তার কি অনিষ্ট করিতে পারে? লীগ-নেতারা ত আর তাকে ভোট দিবে না, ভোট ত দিবে তার এলাকার ভোটাররা।

নযির চুপ থাকিতে দেখিয়া লীগ-নেতা আবার বলিলেন : কি নযির সাহেব, কোনো জবাব দিচ্ছেন না কেন?

নযির এবার মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। সে বলিল : কি জবাব আর আমি দিব? এলাকার লোক আমাকে চায়, অথচ আপনারা আমাকে টিকিট দিলেন না। এটা কি ঠিক হল?

নেতা : এলাকার লোক আপনাকেই চায়, এটা আমরা জানি। তবু আপনাকে আমরা টিকিট দিলাম না। আপনার এলাকার ভোটার-দের লীগ-ভক্তি আমরা পরীক্ষা করতে চাই কি না? এলাকার লোকেরা যাকে চায়, তাকেই টিকিট দিলে ভোটারদের লীগ-প্রীতি ত টেস্ট করা হল না। তারা সত্যই পাকিস্তান চায় কি না, তা ত বোঝা গেল না। সেজন্য এলাকার লোকেরা চায় না এমন লোককেই আমরা লীগ-টিকিট দিয়েছি. বুঝলেন?

তবে লীগ-নেতারাও খবর পাইয়াছেন যে, এলাকার লোক তাকেই চায়? নযির মিঞার সাফল্যের আশা আরও দৃঢ় হইল। তার পণ আরো অনড় হইল। বলিল : দেখুন, আমার এলাকার লোক নিশ্চয় লীগে বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের পসন্দের লোককে টিকিট না দিয়ে তারা যাকে চায় না এমন লোককে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মত এত বড় অন্যায় কিছুতেই তারা বরদাশ্‌ত করবে না। আপনাদের এ অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নিলে এলাকার লোকের প্রতি আমার বিশ্বাসঘাকতা করা হবে।

নেতা : তবে কি আপনি লীগের সিদ্ধান্ত মানবেন না?

নযির : জি না।

নেতা : বেশ, এইবার আপনি তবে যেতে পারেন।

নযির মিঞা বাহিরে আসিতেই খোন্দকার সাহেব ধরা গলায় বলি-লেন : মোবারকবাদ নযির মিঞা, আপনারই বরাত জোর। আমার উপর নেতারা অবিচার করলেন বটে, কিন্তু কি করব? লীগের হুকুম। মেনে নিতেই হল।

নযির মিঞা খোন্দকার সাহেবের এই বিদ্রুপে চটিয়া গেল। কিন্তু কি জবাব দিবে ঠিক করিতে-না-করিতে লীগের চাপরাশী আসিয়া খোন্দকার সাহেবকে ডাকিয়া আবার ভিতরে নিয়া গেল।

খানিক পরেই খোন্দকার সাহেব বলিতে-বলিতে বাহির হইয়া আসিলেন : কি তাজ্জব, কি তাজ্জব!

যথাসময়ে ঘোষণা হইল : খোন্দকার সাহেব লীগ-টিকিট পাইয়াছেন। কারণ তিনি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন।

নযির মিঞাও শেষে জানিতে পারিল যে, নেতারা প্রত্যেক ক্যান-ডিডেটকেই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। যে ক্যানডিডেট নেতাদের সামনে তাঁদের এই 'সিদ্ধান্ত' মানিয়া লইয়াছে, পরিণামে লীগ-টিকিট তাকেই দেওয়া হইয়াছে। লীগ-নেতাদের এই ট্রিকে পরাস্ত হইয়া নযির মিঞা তাঁদের উপর আরও চটিয়া গেল।

লীগ-নেতাদের প্রতি তার আস্থা নষ্ট হওয়ায় পাকিস্তানের প্রতিও সে সন্দিহান হইয়া পড়িল। সে ক্ষুন্ন মনে ও বিষন্ন বদনে লীগ-অফিস হইতে বাহির হইয়া আসিল।

'মেট্রো'-ফেরতা সিনেমা দর্শনার্থীর 'রিগ্যালের' দিকে যাওয়ার মতই নযির মিঞা কৃষক-প্রজার দফ্‌তরে রওয়ানা হইল। কৃষক-প্রজার 'লোক' অদূরে অপেক্ষা করিতেছিলই। কারণ সেখানে কেউ দরখাস্ত করে নাই। নযির মিঞা বিষন্ন মুখে বাহির হইয়া আসিতেই লোকটি বলিল : টিকিট চাই, সাব, টিকিট ?

নযির : কোন্ টিকিট ?

'লোক' : কৃষক প্রজা, জমিয়ত, আহ্‌রার, মজলিস, খাকসার, যেটা চান। সবগুলি চান ত তাও পাবেন। সবই আমার কাছে আছে।

নযির : চলুন।

পরদিন 'জাতীয়তাবাদী' কাগযে নযির মিঞার বিবৃতি বাহির হইল। দীর্ঘ দিনের চিন্তা ও অধ্যয়নে সে এখন কন্‌ভিন্‌স্‌ড হইয়াছে যে, পাকিস্তান দাবি নিতান্তই অবাস্তব ও অন্যায়। জাতীয়তাবাদের অনিষ্ট হওয়ার চেয়ে পাকিস্তানে মুসলমানদেরই অনিষ্ট হইবে বেশী। তদুপরি পাকিস্তানের আইডিয়া ইসলামের মূলনীতি-বিরোধী ইত্যাদি।

এই বিবৃতির সংগে একাধিক কাগযে এই মর্মে সম্পাদকীয় বাহির হইল যে, নযির সাহেবের মত উচ্চশিক্ষিত মুসলমান যুবক পাকিস্তানের ন্যায় দেশদ্রোহী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী 'মিনেসের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার

জন্যই হাজার টাকা বেতনের সরকারী চাকুরি ছাড়িয়া দেশ-সেবায় অবতীর্ণ হইলেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন আত্মত্যাগ এই প্রথম।

লীগের প্রতিজ্ঞা-পত্রে দস্তখত দিয়া প্রতিজ্ঞা ভংগ করিয়াছে বলিয়া নযির মিঞার বিরুদ্ধে এলাকায় যথেষ্ট প্রচার হইল।

ভোটে নযির মিঞা হারিয়া গেল। তার যামানতের টাকাও বাযেয়াফ্‌ত হইয়া গেল।

o o o

বিবি আবার হায়-হায় শুরু করিল।

নযির মিঞা বলিল: তুমি চিন্তা করো না বিবি। আমি চাকুরিতে সত্য-সত্যই রিযাইন দিই নাই। দেশের নেতাদের সত্যিকার চেঞ্জ-অব-হার্ট হয়েছে কি না, তাই পরখ করবার জন্য তিন মাসের ছুটি নিয়েছিলাম মাত্র।

চৈত্র, ১৩৫২।

মতার্ব ইব্রাহীম

১

খান বাহাদুর করিম বখ্স সাহেব বৈঠকখানা গরম করে মোসাহেবদের সংগে আলাপ করছিলেন, এমন সময় তাঁর ছেলে রশিদ লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল। বিজয়-গর্বিত সুরে সে বলল : বাবা, ভারি মজার খবর আছে।

খান বাহাদুর সাহেব হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন : মজার খবর কি? খোশ-খবর ত?

রশিদ : নিশ্চয় খুশির খবর। এবার আপনাকে খান বাহাদুরি খেতাব ছাড়তেই হবে।

খান বাহাদুর সাহেব উৎসাহে সোজা হয়ে বসেছিলেন। আবার চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বললেন : ওঃ এই কথা? এ কথা তোমরা ছেলে-ছোকড়ার মুখে ত বরাবরই শুনে আসছি। তোমাদের এই খেতাব বিদ্বেষ নিতান্ত ছেলেমি ছাড়া কিছুই নয়। তোমরা মনে কর খেতাব না থাকাটাই সমাজ-সেবকের খুব বড় লক্ষণ। ইচ্ছা থাকলে খেতাব নিয়েও দেশের কাজ করা যায় বাবা।

রশিদ : সে কথা বাবা অনেকবার আপনার মুখে শুনেছি। কিন্তু এবার আর ছেলে মানুষের কথা নয়। মুসলিম লীগ সমস্ত মুসলমানকে খেতাব বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে।

খান বাহাদুর মুখ কালো করে ধরা গলায় বললেন : যাও বাজে কথা বলো না। লীগ-নেতারা অমন ছেলেমানুষি করতেই পারেন না।

রশিদ বাবার দুর্বলতায় আমোদ উপভোগ করে বলল : লীগ-নেতারা সত্যই এ সিদ্ধান্ত করেছেন। শুধু করেন নি। বোম্বাই বৈঠকে

উপস্থিত সমস্ত নেতারাই তাঁদের স্যারগিরি, নবাবি, খান বাহাদুরি সব খেতাব বর্জন করেছেন। এই মাত্র রেডিওতে শুনে এলাম।

খান বাহাদুরের যেন তালু-জিভ লেগে গেল। তিনি চেয়ারের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে গেলেন। ধরা গলায় তিনি বললেন: এ কথা কি সত্য বাবা? তুমি নিজ কানে শুনেছ?

রশিদের আনন্দ আর ধরে না। সে সমান উৎসাহে বলল: জি হাঁ, নিজ কানে শুনে এলাম। নিজ কানে না শুনে এমন দুঃসংবাদ কি আপনাকে দিতে পারতাম?

—বলে রশিদ 'মা, ও মা, সুখবর শুনেছেন?'

—বলতে-বলতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মোসাহেবরা খানবাহাদুরের এই বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করা কর্তব্য বোধ করল। তারা আর চুপ করে থাকা উচিত মনে করল না। তাই একজন বলল: এ কি অন্যায়, খেতাব নিয়ে টানাটানি করা কেন?

আরেক জন বলল: এসব হচ্ছে ঐসব লোকের বজ্জাতি যারা নিজেরা অনেক চেষ্টা-তদবির করেও খেতাব পায় নি।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল: আরে রাখ রাখ, লীগ-নেতারা বলল আর অমনি হয়ে গেল? হেঃ। তাদের কথা কে মান্‌তে যাবে? কি করবে তারা, যদি আমাদের খান বাহাদুর সাবরা খেতাব না ছাড়েন?

প্রথম ব্যক্তি বলল: কেন ছাড়তে যাবেন? খেতাব থাকলে পাকিস্তানের কি অসুবিধা হবে? খান বাহাদুর কথাটা ত মুসলমানী কথা, ইংরাজী কথাও নয়, হিন্দুয়ানী কথাও নয়।

এতক্ষণ খান বাহাদুর স্যাহেব নিঝুম চুপ মেরে বসেছিলেন। এবার তিনি বললেন: ব্যাপারটা তোমরা যা ভাবছ অত সোজা নয়; নেতাদের এ সিদ্ধান্তটা যে অন্যায় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হুকুম যদি হয়েই থাকে, তবে সেটা অমান্য করাও ত সহজ নয়। লোকে বলবে কি?

প্রথম মোসাহেব বলল: জি হাঁ, ঠিক কথাই বলেছেন। তাদের কথা না মানলে লীগ থেকে যদি নাম কেটে দেয়, তাতেও ত বদ্‌নাম হবে।

দ্বিতীয় মোসাহেব বলল : শুধু বদ্‌নাম নয়, বিপদও আছে।

তৃতীয় মোসাহেব : বিপদ বল্‌তে বিপদ ? বদমায়েশ ছেলেগুলো রাস্তাঘাটে হৈ হৈ করে অপমান করা শুরু করবে যে।

খান বাহাদুর সাহেব দেখলেন বিপদ সত্যই কম নয়। লীগের আদেশ অমান্য করবার গুপ্ত বাসনা যা মনের কোণে উঁকি মারছিল, এদের কথা শুনে সে বাসনাটাও যেন ভড়কে গেল।

তাঁর মাথাটায় হঠাৎ একটা বেদনা দেখা দিল। তিনি কপালটা টিপে ধরে বললেন : আজ সকাল থেকেই আমার শরীরটা কেমন করছে, একটু সকাল-সকালই শুতে যাব। তোমাদের কোনও কাজ না থাকলে এখন বিদেয় হতে পার।

মোসাহেব জানত, এ অনুরোধ নয়, আদেশ। তারা ঝট্‌পট্‌ দাঁড়িয়ে বলল : আমরা তবে আসি স্যার। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। মেহেরবান আল্লা একটা ছিলা করবেনই। তবে আপনার শরীরটার জন্য বড্ড চিন্তা হচ্ছে। আপনি মাথায় তিল তৈল ও গায়ে একটু গরম সর্ষের তৈল মালিশ করবার—

বাধা দিয়ে খানবাহাদুর বললেন : ওসব আমার জানা আছে। তোমরা একটু তাড়াতাড়ি যাও। আমি গেটটা বন্ধ করে অন্দরে যেতে চাই।

মোসাহেবরা এক রকম দৌড়ের ভরে বিদেয় হল।

২

খান বাহাদুর মেইন গেটটায় তালা লাগিয়ে এসে বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করলেন। তারপর মাথা উঁচু করে দেওয়ালে-লটকানো সোনালী ফ্রেমে-বাঁধা খান বাহাদুরির সনদটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

কত স্মৃতি ঐ সনদের সংগে জড়িয়ে রয়েছে।

কি করে কবে নয়া পাশ-করা উকিল হিসেবে এই শহরে এসেছিলেন, কি করে ব্রিফ্‌লেস্‌ অবস্থায় বটতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কি করে এক রাজনৈতিক মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে সাদা

পুলিশ সুপারকে খুশী করে এসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটরি পেয়েছিলেন, কি করে জিলা বোর্ডের মনোনীত সদস্য হয়ে বেনামীতে কনট্রাক্টরি নিয়ে অনেক টাকা মেরেছিলেন, কি করে হাজার টাকা খরচ করে কালেক্টর সাহেবকে পার্টি দিয়ে খান সাহেব খেতাব পেয়েছিলেন, কি করে যুদ্ধ-তহবিলে দশ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করে দিয়ে খান বাহাদুরি খেতাব ও পাবলিক প্রসিকিউটরি পেয়েছিলেন; বায়োস্কোপের ছবির মত সব ঘটনা তাঁর চোখের উপর ভাসতে লাগল। খান বাহাদুর সাহেবের মনে পড়ল: জীবনে যা কিছু রোযগার করেছেন, তা ইংরাজেরই দৌলতে। মনে পড়ল: যা কিছু ইনকাম হয়েছে, সবই প্রায় খরচ হয়েছে সাহেবদের পার্টি ও অভিনন্দনে। তার বদলে তিনি পেয়েছেন ঐ সোনালী ফ্রেমে-বাঁধা খেতাব। সারা জীবনের হাড়-ভাংগা খাটুনি, জুচ্চুরি, বদমায়েশির এবং দেশ ও সমাজ-দ্রোহিতার বিনিময়ে পেয়েছেন ঐ সনদ। কি করে আজ বুড়ো বয়সে এ খেতাব তিনি ত্যাগ করবেন? সারা জীবনের সাধনার ধন ঐ সনদ, জীবন-ভর একে বুকে ধরে রেখেছেন। আজ জীবন-সায়াহ্নে কোন্ প্রাণে একে বিসর্জন দেবেন? এ যেন সারা জীবনের সহধর্মিণী ও শয্যা-সংগিনীকে জীবন সন্ধ্যায় ত্যাগ করার নির্দেশ এসেছে। ঐ সনদ তাঁর কাছে নিজের একমাত্র পুত্র রশিদের চেয়েও প্রিয়। ঐ সনদ হারায়ে তিনি যে ব্যথা পাবেন, রশিদকে হারালেও সে ব্যথা তিনি পাবেন না! অথচ এই সনদ ত্যাগ করার নির্দেশ তাঁর উপর এসেছে। কি কঠোর! কি নির্মম! পাকিস্তান? পাকিস্তান কি তিনি দেখেন নি; কিন্তু সেটা যত বড় জিনিসই হোক, তা নতুন ত। নতুনের আশায় পুরাতনকে ত্যাগ করা? এ যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। জীবন-ভর যে সনদ তাঁকে সরকারী মহলে সম্মান, জন-সমাজে প্রতিপত্তি, কাজে শক্তি, বিপদে সান্ত্বনা ও ব্যবসায়ে উন্নতি দান করল, আজ এক অজানা-অচেনা পাকিস্তানের জন্য সেই চির জীবনের সাথী খেতাব ত্যাগ করতে হবে? না, না, এ কাজ কিছুতেই খান বাহাদুর সাহেব করতে পারবেন না।

তিনি ভাবতে লাগলেন: কিন্তু না পারলেও ত বিপদ। লীগ থেকে নাম কেটে দেওয়া, জন-সমাজের ধিক্কার খাওয়া, সবই না হয় বরদাশ্‌ত করা গেল নাক-কান বুজে। কিন্তু ছেলেদের ঐ কাল নিশান, আর মুর্দাবাদ, বরবাদ ও ধ্বংস হোক? এ-সব কি বিচ্ছিরি ব্যাপার। আর ঐ হারামযাদা রশিদটা? সে বেটাও ত ঐ দলে যোগ দেবে। না, আর বরদাশ্‌ত হয় না। কোন্ দিকে তিনি যাবেন? খান বাহাদুরের মনে পড়ল ইব্রাহীম নবীর কথা। একমাত্র পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করবার নির্দেশ তাঁর উপর এসেছিল সে যুগে খোদার তরফ থেকে। আর আজ খানবাহাদুরের উপর তেমনি ত্যাগের নির্দেশ এল বর্তমানযুগে খোদার চেয়েও প্রতাপশালী পার্টির তরফ থেকে। মনে তাঁর একটু তসল্লি এল।

চেয়ারে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে অতি সন্তর্পণে তিনি দেওয়াল থেকে সনদটি পাড়লেন। চেয়ার থেকে নেমে ঝুলানো টেবিল ক্লথের আঁচল দিয়ে সযত্নে তা মুছলেন। তারপর তাকে লম্বা হাতে টেবিলের উপর খাড়া করে এক ধ্যানে সনদটির দিকে চেয়ে রইলেন। ভাল করে দেখবার জন্য একবার এগিয়ে আনলেন, আবার পিছিয়ে নিলেন। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে নযর দিয়ে কতভাবে সনদটি দেখলেন। যতই দেখেন ততই ভাল লাগে। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ থাকা চল্‌ল না। লম্বা হাত আস্তে-আস্তে শিথিল ও বাঁকা হয়ে সনদটি খান বাহাদুরের বুকের কাছে এসে পড়ল।

তিনি সবলে ওটাকে বুকে চেপে ধরলেন।

দর-দর করে খান বাহাদুর সাহেবের চোখ থেকে পানি বেরিয়ে তাঁর সাদা দাড়ি ভিজিয়ে দিল।

ওদিকে বিবিসাহেব ছেলের মুখে খবর পেয়ে তার সংগে ভালমন্দ নিয়ে তর্ক বাঁধিয়ে বসেছিলেন। তর্ক শেষ হয়ে এসেছে অথচ খান বাহাদুর সাহেব অন্দরে আস্‌ছেন না দেখে বিবি সাহেব চিন্তাযুক্ত হয়ে বৈঠকখানায় উঁকি দিলেন। খান বাহাদুর সাহেবকে ধ্যানস্থ দেখে তিনি পা টিপে-টিপে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

ঢুকে যা দেখলেন তাতে বিবি সাহেবেরও চোখ ঠেলে পানি আসতে লাগল।

তিনি পরম আদরে স্বামীর কাঁধে হাত রাখলেন।

খান বাহাদুর চমকে উঠলেন। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলেন বিবি সাহেব। তাঁরও চোখে পানি।

তিনি বিবি সাহেবের কোমরে হাত জড়িয়ে বললেন: কোনো ভাবনা করো না বিবি, মাথার উপর খোদা আছেন।

বললেন বটে, কিন্তু নিজেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

বিবি সাহেব হাজার হোক মেয়ে মানুষ। স্বামীর কান্নায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিজেকে সামলাতে না পেরে বললেন: হায় আমাদের কি হবে গো। খোদা এ কি সর্বনাশ করলে গো।

রাস্তার লোক শুনতে পাবে ভয়ে খান বাহাদুর সাহেব বিবি সাহেবকে ধরে নিয়ে অন্দর মহলে চলে গেলেন।

বিবি সাহেবের অনেক সাধাসাধিতেও রাতের খানা না খেয়েই সমস্ত লাইট নিবিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সারারাত ঘুম হল না।

বিবি সাহেবও ঘুমোতে পারলেন না। তিনি জেগে-জেগে দেখলেন, সাহেব সারারাত জেগে বারান্দায় পায়চারি করছেন, আর কি যেন ভাবছেন।

তিনি উঠে এসে প্রবোধ দিয়ে ধীরে-ধীরে হাত ধরে সাহেবকে হয়ত এনে বিছানায় শুইয়েছেন, কিন্তু চোখ একটু লেগে আসতেই আবার দেখেছেন, সাহেব উঠে গিয়ে আবার পায়চারি করছেন। এমনি করে কোনমতে রাতটা কাটল।

সকালে অনেকক্ষণ ধরে ফজরের নমায পড়ে উঠে এসে খানবাহাদুর বিবিকে বললেন: বিবি কোন চিন্তা করো না। হিল্লে খোদা একটা করবেনই। আমি একটা ফন্দি ঠাউরিয়েছি। আমি কোল্‌কাতা যাব। তুমি তার ব্যবস্থা কর।

৩

যথাসময়ে খানবাহাদুর কোলকাতা গেলেন। সেখানে কিছুদিন এবাড়ী-ওবাড়ী ঘুরাফেরা ও সলা-পরামর্শ করলেন।

শেষে একদিন খবরের কাগযে ইশতাহার বের হল এই মর্মে যে ফলানা তারিখে মুসলিম ইনষ্টিটিউটে মুসলিম খেতাবধারীদের এক সম্মেলন হবে। আলোচ্য বিষয়ঃ মুসলিম লীগের বোম্বাই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে খেতাবধারীদের কর্তব্য আলোচনা। খেতাবধারী ব্যতীত অন্য লোকের প্রবেশাধিকার থাকবে না।

যথাসময়ে সম্মেলনের বৈঠক বসল। মুসলিম লীগের বোম্বাই বৈঠকে হাযির ছিলেন অথচ এখনও উপাধি ছাড়েন নি, এমন একজন খেতাব-ধারী সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

কিন্তু বাইরে গোলমালের জন্য সভার কাজে বিঘ্ন হতে লাগল। দু'একজন বাইরে এসে দেখলেন, স্কুল-কলেজের ছেলেরা মিছিল করে এসে সভা-গৃহের সামনে ভিড় করেছে। তারা বলছেঃ লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, খেতাবধারীর লেঙ্গে জান।

কেউ আবার বলছেঃ খেতাবধারীর কাটব কান।

কোনো কোনো দুষ্ট ছেলে রসিকতা করে আরও বলছেঃ আরে কান কোথায়? বল খেতাবধারীর কাটব লেজ।

হাঙ্গামা হওয়ার আশঙ্কায় খেতাবধারীরা সভা-গৃহের দরজা বন্ধ করে দিলেন। সভার কাজ শান্তিপূর্ণ ভাবে চলল।

সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমাদের খানবাহাদুর সাহেব উদ্বোধনী বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেনঃ মুসলিম লীগের পক্ষে এই খেতাব বর্জনের প্রস্তাব করা ঠিক হয় নি। এ প্রস্তাব অন্যায় অনাবশ্যক ইল্-লিগ্যাল আন্ কনষ্টিটিউশন্যাল এবং আলট্রাভাইরিস। এমন কি, ইট এমাউন্ট্স টু ডিস্লয়েলটি টু দি কিং। কারণ রাজার-দেওয়া খেতাব ত্যাগ করার সোজা অর্থ রাজাকেই অমান্য করা। অথচ এ ডিস্লয়েলটি

পত্র প্রপার অথরিটি কর্তৃক গৃহীত না হয়, ততদিন চাকুরিয়ার দায়িত্ব পুরামাত্রায় বজায় থাকে। এই নযির অনুসারে আমি রুলিং দিচ্ছি যে এই বক্তার খানবাহাদুরি আজও বহাল আছে।

—এই বলিয়া সভাপতি বক্তাকে বক্তৃতা করবার অনুমতি দিলেন।

—বক্তা বলতে লাগলেন : লীগ-নেতারা খেতাব বর্জনের প্রস্তাব করে ঠিক কাজই করেছেন। এ প্রস্তাব আল্‌ট্রা-ভাইরিসও নয়। কারণ লীগ জমিদারি-প্রথা ও ধনতন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত কায়েমী প্রথা উচ্ছেদ করবার প্রস্তাব আগেই গ্রহণ করেছে। অন্যান্য কায়েমী প্রথার মত খেতাবও একটা কায়েমী স্বার্থ। অতএব জমিদারি প্রথার সংগে-সংগে খেতাব উচ্ছেদ হওয়া অত্যাবশ্যক।

আর একজন খানবাহাদুর সভাপতির এজাযত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লীগ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করে এই বলে উপসংহার করলেন যে জমিদারি উচ্ছেদের ন্যায় যদি খেতাব উচ্ছেদেও লীগ-নেতাদের অভিপ্রায় হয়, তবে জমিদারের যেমন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, খেতাবধারীদেরও তেমনি ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হোক। কারণ আমরা খেতাব অর্জনে যে পরিমাণ অর্থ এবং যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করেছি, তাতে একাধিক জমিদারি কিনতে পারতাম।

অধিকাংশ সদস্য এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ফলে ক্ষতিপূরণসহ খেতাব উচ্ছেদের সমর্থন করে প্রস্তাবের মুসাবিদা হল এবং তা জাবেদাভাবে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হল।

প্রায় পাশ হয়ে যায় আর কি!

মুসলিম লীগের টেযারার ভূতপূর্ব সি. আই. ই. দেখলেন বিপদ। এতটাকা ক্ষতিপূরণ দিলে মুসলিম লীগের তহবিল শেষ হয়ে অনেক দেনা হয়ে যাবে এবং পাকিস্তান দেনাগ্রস্ত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

তাই তিনি বক্তৃতা করতে উঠলেন। বললেন : খেতাবকে জমিদারির সাথে তুলনা করা অন্যায় ও অসঙ্গত। কারণ জমিদারিতে খাযনা পাওয়া যায়; কিন্তু খেতাবের দরুন কোন খাযনা পাওয়া যায় না; বরঞ্চ

উল্টা চাঁদা দিতে হয় যুদ্ধ-তহবিলে এবং লটে-বেলাটের অভিনন্দন-তহবিলে। তাছাড়া জমিদারি বিক্রয় হয়, খানবাহাদুরি বিক্রয় করা অথবা মর্গেজ দেওয়া চলে না। ফলে খানবাহাদুরিতে শুধু খরচ হয়, আয় হয় না। অতএব খেতাব বর্জনকে জমিদারি উচ্ছেদের সংগে তুলনা করা চলে না। জমিদারি একটা বৈষয়িক কারবার। ক্ষতিপূরণ ঐ কারবারের কন্‌সিডারেশন অর্থাৎ পণ; এক ধনের বিনিময়ে অন্য ধন লাভ করা। আর খেতাব বর্জন হচ্ছে একটা ত্যাগ, একটা স্যাক্রিফাইস। স্যাক্রিফাইসের কোনও পণ বা দাম থাকতে পারে না। পাকিস্তানের জন্য কায়েদ-ই-আযম আমাদের কাছে এই স্যাক্রিফাইস দাবি করেছেন। ভাই সাহেবান, কায়েদ-ই-আযমের ডাকে আপনেরা কি এই স্যাক্রিফাইসটুকু করবেন না?

সভায় যে আন্দায করতালি-ধ্বনি হল, তাতে এই বক্তার বক্তৃতার পরে-পরেই প্রস্তাব ভোটে দিলে বিনা-ক্ষতিপূরণে খেতাব বর্জন পাশ হয়ে যাবে দেখে আমাদের খানবাহাদুর আবার দাঁড়ালেন। তিনি বললেন: আমরা যেখানে পাকিস্তানের জন্য আমাদের জান-মাল ছেলেমেয়ে কোরবানি করতে রাযী আছি, সেখানে এই সামান্য উপাধি বর্জনের জন্য কায়েদ-ই-আযমই বা যিদ করছেন কেন?

পূর্বোক্ত বক্তা জবাব দিতে ওঠে বললেন: এটা সামান্য ত্যাগের দাবি নয়; বরঞ্চ মুসলমানেরই যোগ্য ত্যাগের দাবি? মুসলমান জাতি ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। যুগ-যুগ তারা সত্যের জন্য আল্লার রাহে তাদের শ্রেষ্ঠ বস্তু কোরবানি করে এসেছে। আল্লাহ-পাক হযরত ইব্রাহীমকে তাঁর হৃদয়ের নিধি নয়নের জ্যোতি প্রিয়তম পুত্র ইসমাইলকেই কোরবানি করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এ-যুগে আমাদের কায়েদ-ই-আযম আমাদের প্রাণ-প্রিয় হৃদয়ের নিধি চোখের পুতুলি অন্ধের যষ্টি খেতাব কোরবানি করবার নির্দেশ দিয়েছেন। সে যুগে পুত্রই ছিল মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। তাই তখন পুত্র কোরবানির হুকুম হয়েছিল। আর আজ খেতাবই হয়েছে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। অতএব

এ যুগে আমাদিগকে খেতাবই কোরবানি করতে হবে। যদি সে যুগে না হয়ে এইযুগে হযরত ইব্রাহীম নাযিল হতেন, তবে তাঁর উপর পুত্র-কোরবানির আদেশ না হয়ে খেতাব কোরবানিরই আদেশ হত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব ভাই সাহেবান, আপনারা খেতাব কোর-বানি করে সকলে মডার্ন ইব্রাহীম হোন। দাদা ইব্রাহীমের ঐহিত্য বজায় রাখুন, তাঁর বিপুল কোরবানির গৌরবোজ্জল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করুন।

করতালি ধ্বনিতে সকলের কানে তালি লাগল। প্রতিবাদকারীদের প্রতিবাদ স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেল।

বিপুল ভোটাধিক্যে বিনা-ক্ষতিপূরণে খেতাব কোররানির প্রস্তাব পাশ হল।

৪

পরাজিত ও আহত সৈনিকের বেশে আমাদের খানবাহাদুর সাহেব পরদিন বাড়ী পৌছলেন।

বিবি সাহেব দেখে ভয় পেলেন। অতি যত্নে স্বামীর হাত-মুখ ধুইয়ে নাশ্‌তা ও চা'র আয়োজন সামনে এনে বললেন: খবর কি? কোন হিল্লে হল?

দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে খানবাহাদুর সাহেব বললেন: হিল্লে আর কি হবে? কিছুই হল না। ছাড়তেই হবে।

বিবি সাহেব একটা হাত পাখা নিয়ে স্বামীকে হাওয়া কচ্ছিলেন। তিনি পাখাটা ঘন-ঘন নেড়ে জোরে হাওয়া চালিয়ে বললেন: ছাড়তে হবে? কেন ছাড়তে হবে? গোলামের বেটাদের কথা মানতেই হবে? তারা কি—?

বাধা দিয়ে খানবাহাদুর বললেন: এবার আর গোলামের বেটাদের কথা নয় বিবি, নিজেরাই প্রস্তাব পাশ করে এসেছি।

খানবাহাদুর তাঁর সম্মিলনীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। সমস্ত শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিবি সাহেব বললেন: তবে ত ছাড়তেই হয়।

এক দৃষ্টিতে বিবির মুখের দিকে চেয়ে খানবাহাদুর সাহেব বললেন : তুমিও বল্‌ছ ছাড়তে হবে ?

বিবি আমতা-আমতা ক'রে বললেন : তা সভা করে যখন মত ঠিক করেই এসেছেন, তখন সে মোতাবেক কাজ ত করতেই হবে।

ঠিক বলেছ বিবি, ঠিক বলেছ। কথা যখন দিয়ে এসেছি তখন ছাড়তেই হবে।

—বলতে বলতে খানবাহাদুর সাহেব আসন ছেড়ে উঠলেন। কিন্তু বিবির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন : কিন্তু জান বিবি, তোমাকে এ বয়সে হারালে আমার যে কষ্ট হবে, খেতাব ত্যাগের ক তার চেয়ে কম হচ্ছে না। মমতাযকে হারিয়ে শাহাজানের কি ব্যথা হয়েছিল, আজ তা বুঝতে পারছি। আমি খেতাব ত্যাগ করব বটে, কিন্তু তার উপর আমি তাজমহল রচনা করব।

যথাসময়ে খানবাহাদুর সাহেব তাঁর খেতাব ত্যাগের পত্র যেদিন লাটের কাছে পাঠালেন সেদিন বাড়ীর সামনের বাগানের ঠিক মাঝখানে ধুমধামের সংগে সোনালী-ফ্রেমে-বাঁধা সনদটির দাফন করলেন এবং তার উপর একটি ক্ষুদে মাকবেরা তৈরী করে তাতে মার্বেল পাথরে প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজীতে লিখে রাখলেন :

পাকিস্তান জিহাদের প্রথম শহীদ
শায়িত হেথায়।

বৈশাখ ১৩৫৩

ইলেকশন

১

কে. বি. স্কোয়ার সরকারী চাকরি থেকে মাত্র সেদিন রিটায়ার করেছেন। করেই তিনি ঘোষণা করেছেন, তিনি এবার ইলেকশনে দাঁড়াবেন। ঘোষণাটা তিনি রিটায়ার করবার পরে করলেন বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তটা করেছিলেন তিনি চাকরিতে থাকতেই।

কে. বি. স্কোয়ার ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এস. ডি ও. হিসাবে তিনি রিটায়ার করেছেন। চাকরিতে আর দুএক বছর থাকতে পারলে তিনি এ. ডি. এম. হতে পারতেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এক্সটেনশন দিতেও রাযী ছিলেন। কিন্তু আইনসভায় সরকার-বিরোধী দল এক্সটেনশনের বিরুদ্ধে তুমুল হৈ-চৈ করায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকারপক্ষ তা মেনে নিয়েছেন। এক্সটেনশন না দেওয়ার এই নয়া নীতি পড়বি ত পড় একেবারে কে. বি. স্কোয়ারের ঘাড়ে। ইংরাজ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এর প্রতিকার চেয়ে প্রতিকার না পেলেও তিনি তসল্লি পেয়েছেন। ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট প্রবোধ দিয়ে কে. বি. স্কোয়ারকে বলেছেন: কি করব বল কে. বি. স্কোয়ার? তোমার দেশের নেতারাই স্বরাজ-স্বাধীনতার জন্য হৈ-চৈ করছে। অথচ এখন নিজ চক্ষেই দেখলে এরা স্বাধীনতার যোগ্য হয়নি। হত যদি, তবে তোমার মত যোগ্য ও অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে এক্সটেনশন দিতে দিল না। বলি তোমার মত যোগ্য ম্যাজিস্ট্রেট তোমার দেশে কটা আছে?

এরপরই কে. বি. স্কোয়ার চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি রিটায়ার করবার পরেই আইনসভার ইলেকশনে দাঁড়াবেনই। এর কিছুদিন

৮—

আগে থেকেই তিনি বুঝতে পারছিলেন যে বাজে লোক দিয়ে আইনসভা ভর্তি হচ্ছে। এদের সকলের লেখাপড়াও তেমন নেই। আর যারা লেখাপড়া জানেও, যেমন উকিল-মোক্তার-ডাক্তার, তাদেরও শাসন-ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কাজেই এরা কেউ আইনসভার মেম্বর হওয়ার যোগ্য নয়? অথচ আহমক গর্দভ ভোটাররা এইসব বাজে লোককেই ভোট দিয়া থাকে। বাজে লোক বাজে লোককে, মূর্খেরা মূর্খকে ভোট দিবে, এটাই স্বাভাবিক। এটা যে হবেই কে. বি. স্কোয়ার তা জানতেন। সেজন্য তিনি বরাবরই দেশের স্বরাজ-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। তিনি নাক সিটকিয়ে বলতেন: ভোট দিতে জানলে না ভোটাধিকার পাবে? মূর্খ দেশবাসী ফ্র্যাঞ্চাইযের জানে কি? বানরের গলায় মুক্তোর হার দিয়ে হবে কি? আগে লেখাপড়া শিখুক, তারপর স্বরাজ-স্বাধীনতা। তিনি এসব কথা যেমন মুখে বলতেন, তেমান সরকারী রিপোর্টেও লিখতেন।

কিন্তু কে. বি. স্কোয়ারের এমন প্রবল ও যুক্তিপূর্ণ বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ইংরাজ সরকার দেশের অর্ধেকের বেশী শাসন-ভার দেশী মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিলেন এবং সেই মন্ত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব চেপে দিলেন মূর্খ নির্বোধ গ্রামবাসীর ঘাড়ে।

বানরের গলায় যখন মুক্তোর মালা সরকার দিয়েই ফেলেছেন, তখন বানর যাতে সেটা নষ্ট না করে, সেদিকে নযর দেওয়া কে. বি. স্কোয়ার তাঁর সরকারী পবিত্র কর্তব্য মনে করলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন, শুধু ভোটারদেরে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যোগ্য লোক না দাঁড়ালে, অগত্যা তারা অযোগ্য লোককেই ভোট দিবে। অতএব ঠিক করলেন, সময় ও সুযোগ পেলে তিনি নিজেই নির্বাচনে দাঁড়াবেন।

অফিসার হিসেবে কে. বি. স্কোয়ার সত্যই যোগ্য ছিলেন। এস. ডি. ও. হিসাবে তিনি দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলেন। তাঁর ভয়ে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খেত। স্বরাজ-স্বাধীনতাওয়ালাদেরে তিনি দুহাতে গ্রেফতার করতেন এবং লম্বামেয়াদী শাস্তি দিতেন। এসব ব্যাপারে তিনি বাপকেও

খাতির করতেন না। কারণ এসব শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাপার। এতে একটু ঢিলা দিলে দেশে অরাজকতা এসে পড়বে।

দোর্দণ্ড প্রতাপের জন্য লোকে কে. বি. স্কোয়ারকে যেমন ভয়ও করত, তাঁর যোগ্যতা, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা ও জনহিতকর কাজের জন্য লোকে তাঁর প্রশংসাও করত। স্কুল-মাদ্রাসাকে সাহায্য করার ব্যাপারে, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও মেরামতের ব্যাপারে এবং কচুরিপানা সাফ করবার ব্যাপারে তিনি কঠোর-কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। তাতে দু-চার দশজন লোকের উপর জুলুম হত বটে এবং সেজন্য তাদের কাছে তিনি অপ্রিয় হতেন বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের তাতে উপকার হত এবং সেজন্য তিনি জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষভাবে মুসলমানদের কাছে তাঁর জনপ্রিয় হওয়ার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। তিনি বদাচ কোট-নেকটাই পরতেন না। সর্বদাই আচকান পাজামা পরতেন এবং সব সময়ে মাথায় টুপি এবং ঈদের দিন পাগড়ি পরতেন। তিনি সুন্নতী দাড়ি ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির মাঝামাঝি দাড়ি রাখতেন এবং ঐটুকু দাড়ি নিয়েই তিনি দাড়িহীন মুসলমানদের নিন্দে করতেন। কে. বি. স্কোয়ার যেখানেই থাকুন, আফিসে বা মফস্বলে, পাঞ্জেগানা নমায ঠিক ওয়াক্ত মত আদায় করতেন। আর মুসলমানদের সভায় তিনি স্বরাজ-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই যুক্তি দিতেন যে, ইংরাজ না থাকলে হিন্দুদের অত্যাচারে মুসলমানরা এদেশে টিকতে পারবে না।

এই অবস্থায় স্বায়ত্তশাসন ও ভোটাধিকার যখন দেশে এসেই পড়ল, তখন স্বভাবতঃই কে. বি. স্কোয়ার নিজের আফিসে বসে এবং মফস্বল টুওরের সময়ে বলে বেড়াতে লাগলেন : ভোটাররা যেন শুধু যোগ্য লোককেই ভোট দেয়। তিনি কোনও প্রার্থীর পক্ষে কোনও কথা বলতেন না। কারণ প্রার্থীদের প্রায় সকলেই কোনও-না-কোন পার্টির তরফ থেকে দাঁড়িয়েছেন। পার্টির মধ্যে কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি। কে. বি. স্কোয়ার বরাবর কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পার্টির বিরোধী। কংগ্রেসের তিনি বিরোধী ছিলেন ওরা ইংরাজ তাড়াতে চায় বলে।

আর কৃষক প্রজা পার্টি'র বিরোধী ছিলেন ওরা খাযনা বন্ধ বা কম করতে চায় বলে। কৃষক-প্রজাদের তিনি 'স্লিপিং টাইগার' বলতেন। ওদেরে জাগানো মানেই ঘুমন্ত বাঘ জাগানো। তার মানেই দেশে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করা। তা ছাড়া জমিদাররা দেশের বড় বড় সমস্ত হাসপাতাল কলেজ-স্কুল চালাচ্ছেন বলে কে. বি. স্কোয়ার সত্য-সত্যই জমিদারদের গুণ-মুগ্ধ ছিলেন। এসব কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই গোড়ার দিকে কংগ্রেস কৃষক-প্রজা পার্টি'র বিরোধিতা করার সাথে-সাথে মুসলিম লীগের সমর্থন করতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে মুসলিম লীগও দেশের স্বাধীনতা দাবী করায় এবং জমিদারী উচ্ছেদের প্রস্তাব করায় তিনি মুসলিম লীগেরও বিরোধী হয়ে উঠেন। ফলে তিনি সব রাজ-নৈতিক পার্টি'রই বিরোধী ছিলেন। এমতাবস্থায় যখনই তিনি যোগ্য লোককে ভোট দেওয়ার কথা বলতেন, বুদ্ধিমান শ্রোতারা তখনই বুঝে নিত, ঐ সব পার্টি'র বাইরে খানসাহেবী মনোভাবের যেসব ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ক্যানডিডেট দাঁড়িয়েছেন কে. বি. স্কোয়ার এস. ডি. ও. সাহেব তাঁদেরে সমর্থন করতেই বলছেন।

কিন্তু ভক্তের দল কে. বি. স্কোয়ারকে বলতঃ হুযুর, আপনি নিজে দাঁড়াতে পারেন না?

উত্তরে কে. বি. স্কোয়ার বলতেনঃ সরকারী অফিসাররা ইলেকশনে দাঁড়াতে পারেন না এটা আইন।

ভক্তেরা আফসোস করে বলতঃ কি অন্যায় অসঙ্গত আইন। যোগ্য, অভিজ্ঞ ও বিদ্বান লোকেরা সবাই ত সরকারী কর্মচারী। তাঁরাই যদি আইনসভার মেম্বর হতে না পারবেন, তবে ভোটাররা যোগ্য লোক পাবে কোথায়?

কে. বি. স্কোয়ার ভক্তদের সাথে একমত হতেন যে এই ব্যবস্থা অসঙ্গত। যোগ্য ও বিদ্বান লোকদেরে আইনসভায় যেতে না দিয়ে অযোগ্য ও অসাধু রাজনীতিকরা নিজেরাই দেশের মিনিস্টার হবার মতলবেই এই ব্যবস্থা করেছেন।

অতঃপর ভক্তেরা বলতঃ চাকুরি ছেড়ে দিয়েই তবে আইনসভার মেম্বর হয়ে যান না, হুযুর।

কে. বি. স্কোয়ার বলতেন ঃ চাকুরি আর বেশী দিন নেই। এখন রিযাইন করলে অল্পের জন্য পেনশনটা মারা যাবে। তা ছাড়া এস. ডি. ও. হিসেবে জনসাধারণের খেদমত করার স্কোপ বেশী। তারপর সবচেয়ে বড় কথা, কে. বি. স্কোয়ার চাকুরি ছেড়ে দিলে এখানে এস. ডি. ও: হয়ে আসবে একজন হিন্দু। দেশে কয়টা মুসলমান এস. ডি. ও. আছে?

ভক্তেরা হিন্দু এস. ডি. ও. আসার সম্ভাবনায় শিউরে উঠত। তারা তখন বলতঃ বেশ হুযুর, তবে চাকুরি থেকে রিটায়ার করেই আইনসভায় দাঁড়াবেন এবং আমাদের এলাকা থেকেই দাঁড়াবেন। দেখবেন সব মুসলমান এক জোটে আপনাকেই একচেটে ভোট দিবে। আমরা গ্যারান্টি থাকলাম।

সেই থেকেই কে. বি. স্কোয়ারের মাথায় ঢুকে আইনসভার মেম্বর-গিরির কথা। তারপর তিনি অনেক জায়গায় এস. ডি. ও. গিরি করেছেন। সর্বত্রই ঐ এক কথা। সকলেরই দাবি, এস. ডি. ও. সাহেব ক্যানডিডেট হলে একচেটে ভোট।

রাজনৈতিক পার্টিসমূহের লোকজনের অযোগ্যতা তাদের অনভিজ্ঞতা ও অসাধুতা সম্বন্ধে কে. বি. স্কোয়ার নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি নিজে আইনসভায় গেলে আইনসভার চেহারা বদলিয়ে দিতে পারেন এবং নির্ঘাত মিনিস্টার হতে পারেন, তাতেও তাঁর মনে কোনও দিন সন্দেহ ছিল না। দাঁড়ালেই নির্বাচিত হবেন, এ বিষয়েও কোনও তর্ক ছিল না। অবশেষে এক্সটেনশন না পাওয়ায় এ বিষয়ে তাঁর সব দ্বিধা-সন্দেহ দূর হয়ে গেল। তখনই তিনি পাকাপাকি স্থির করলেন রিটায়ার করেই তিনি দাঁড়াবেন।

২

ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খোদাবখ্শ সাহেব একাদিক্রমে প্রায় সাত বছর এস. ডি. ও. গিরি করার পর তাঁর রাজভক্তি ও জন-সেবার পুরস্কার

স্বরূপ যেদিন খানবাহাদুরি খেতাব পেলেন, সেদিন আর যে যাই বুঝুক, স্বয়ং খোদাবখ্‌শ সাহেব বুঝলেন, অনেক দিন পর ইংরাজ সরকার একটা সত্যিকার গুণ-গ্রাহিতার কাজ করলেন। একথা খোদাবখ্‌শ সাহেব সবসময় বলতেনও এবং প্রকাশ্যভাবেই বলতেন। সংগে সংগে তিনি শ্রোতৃ-মণ্ডলিকে এও স্মরণ করিয়ে দিতেন: খানবাহাদুর হতে গেলে খান-সাহেবির দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়; সোজাসুজি খানবাহাদুর ইংরাজ সরকার বড় কাউকে করেন না। খোদাবখ্‌শ সাহেবই এর ব্যতিক্রম। কাজেই লাট সাহেবের নযরে খোদাবখ্‌শ সাহেবের স্থান কোথায়, এটা বোঝা কারও পক্ষে কঠিন হওয়া উচিত নয়।

সুতরাং এই খেতাবটিকে তিনি এতই মূল্যবান মনে করতেন যে দৈনিক হাজার সরকারী ফাইলে দস্তখতী ইনিশিয়াল দিবার বেলাতেও তিনি আগের মত খোদাবখশের বদলে শুধু 'কে. বি.' না লিখে খান বাহাদুরের বদলেও তিনি আরেকটা 'কে. বি.' লিখতেন। ফলে ঐদিন হতে বরাবর তিনি 'কে. বি. কে. বি.' ইনিশিয়াল দিয়েই সরকারী কাগয-পত্রে সই করতেন। এতে স্বভাবতঃই সময় একটু বেশী লাগত। একবার এক প্রবীণ পেশকার কাজের ক্ষিপ্রতার জন্য এবং হুযুরের নিজেরই শ্রমলাঘবের জন্য 'কে, বি, কে, বি,' এর স্থলে সংক্ষেপে 'কে, বি, স্কোয়ার' লিখতে পরামর্শ দেন। খানবাহাদুর খোদাবখশ প্রথমে এটাকে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ মনে করে অন্তরে-অন্তরে গোস্বা হন। কিন্তু কিছু বলেন না। এর অল্পদিন পরেই নবাগত তরুণ ইংরাজ ডি, এম, হাসিমুখে এস. ডি, ও, খানবাহাদুর খোদাবখশকে 'কে, বি, স্কোয়ার' বলে সম্বোধন করায় তিনি সাগ্রহে পুছ করেন: ডু ইউ লাইক দিস এব্রেভিয়েশন স্যার ?

তরুণ ইংরাজ ডি, এম, উৎসাহ ভরে বলেছিলেন: লাইক ইট ? এ থাউযেণ্ড টাইমস। ইট সাউণ্ডস সো নাইস।

এরপর থেকেই অফিশিয়াল মহলে খানবাহাদুর খোদাবখশ 'কে, বি, স্কোয়ার' রূপে মশহুর হন। নিজেও একবার 'কে, বি,' লিখে তার উপর অঙ্কে দুই বসিয়ে ইনিশিয়েল দিতে থাকেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায়

যে লোকজন ও কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর আসল নাম ভুলে যায়। ক্রমে আফিসে আদালতে, রাস্তা-ঘাটে, শহরে-মফস্বলে সর্বত্র তিনি 'কে. বি. স্কোয়ার' নামে সুপরিচিত হন। মফস্বল হতে প্রতিদিন শতশত দরখাস্ত এস. ডি. ও.র নিকট আসত এবং মাসে দু-চারটা মুদ্রিত অভিনন্দন-পত্রও পাওয়া যেত যাতে 'মহামান্য কে. বি. স্কোয়ার এস. ডি. ও. বাহাদুরের খেদমতে বা করকমলেষু' লেখা থাকত।

কিন্তু আইনসভার মেম্বর হবার জন্যে এতকালের এই জনপ্রিয় নাম তাঁকে আজ ছাড়তে হচ্ছে। আবার পুরাতন খানবাহাদুর খোদাবখ্‌শে ফিরে যেতে হচ্ছে। এটা একটা সমস্যা। প্রথম কারণ, ভোটাররা ভোট দিতে গিয়ে গোলমালে না পড়ে। দ্বিতীয় কারণ, ভোটার লিস্টে খানবাহাদুর খোদাবখ্‌শই ছাপা হয়েছে, 'কে. বি. স্কোয়ার' ছাপা হয় নি। কাজেই আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। আসল নামকেই আবার পপুলার করতে হবে। এটা এক নম্বর সমস্যা।

দুই নম্বর সমস্যা এই যে, তিনি দাঁড়াবেন কোন্ এলাকায়? যত মহকুমায় তিনি এস. ডি. ও. ছিলেন, সে-সব জায়গার যে-কোনো নির্বাচকমণ্ডলি থেকে তিনি দাঁড়াতে পারেন। সব জায়গার লোকই তাঁকে চায়, সব জায়গা থেকেই তিনি নির্বাচিতও হবেন নিশ্চয়। কারণ ভোট পাবেন তিনি একচেটে। এ সব কথা তাঁর অনুমান নয়। স্থানীয় নেতাদেরই কথা। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর প্রেসিডেন্ট স্থানীয় উকিল-মোখ্‌তার সবাই একবাক্যে এই একই কথা বলেন। খানবাহাদুর খোদাবখ্‌শ খুব বুদ্ধিমান ও হিসেবী লোক। তিনি কদাচ তোশামুদে ভুলেন না। তিনি জানেন, উকিল-মোখ্‌তাররা এসেছেন তাঁর কাছে বেইল পিটিশন নিয়ে; আর মেম্বর; প্রেসিডেন্টরা এসেছে নমিনেশন টিউব-ওয়েল ও রিলিফের টাকা চাইতে। কাজেই তাঁরা এস. ডি. ও.কে খুশী করার জন্য নিশ্চয় অনেকখানি বাড়িয়ে বলেছেন। সেটা খানবাহাদুর খোদাবখশ বুঝেন। তাঁকে ফাঁকি দেয়, এমন উকিল-মোখতার বা ইউ. বি. প্রেসিডেন্ট আজও তার মায়ের পেটে। কাজেই ঐ সব লোকের

কথা তিনি অনেকখানি বাদ-খাস্তা দিয়েই হিসেব করেছেন। নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ওযনে মেপেও তিনি বুঝতে পেরেছেন, যেখানে-যেখানে তিনি এস. ডি. ও. গিরি করেছেন, তার সব এলাকাতেই তিনি জনপ্রিয়। ঐ সব লোকের কথামত সব ভোট একচেটে ভাবে তিনি যদি নাও পান, তবু বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত যে হবেন, প্রতি-পক্ষদের সকলের যামানতের টাকা যে বাযেয়াফত হবে, তাতে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

কাজেই খানবাহাদুর সাহেব এলাকা বাছাই নিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন। শিশুরা জীবনের প্রথম মেলায় গিয়ে যেমন গোলক-ধাঁধাঁয় পড়ে, সব জিনিসই তাদের ভাল লাগায় কোনটা ফেলে কোনটা কিনবে তা যেমন ঠিক করতে পারে না, অবশেষে বাজার-শুদ্ধ সব জিনিস কেনবার জন্য তারা যেমন যিদ ধরে, খানবাহাদুর খোদাবখশের অবস্থা হল ঠিক তেমনি। সব এলাকায় তাঁর জয়লাভ নিশ্চিত। এ অবস্থায় কোন্ এলাকা ফেলে তিনি কোন্ এলাকায় দাঁড়াবেন? তাছাড়া, সব এলাকায় নেতাদের কাছেই তিনি ওয়াদা করে এসেছেন যে রিটায়ার করবার পর তাঁদের এলাকা থেকেই তিনি দাঁড়াবেন। এখন এক এলাকায় দাঁড়ালে অন্যান্য এলাকার লোকেরা তাঁকে কি বলবে? তারা কি মনে করবে না যে খানবাহাদুর সাহেব তাদের সাথে ওয়াদা খেলাফ করলেন?

এই দুটানায় পড়ে একবার খানবাহাদুর ঠিক করলেন তিনি সব এলাকাতেই দাঁড়াবেন। কিন্তু পরে নিয়ম-কানুন পড়ে হিসেব করে দেখলেন যে প্রত্যেক এলাকার দরখাস্তের সাথে আলাদা করে সিকিউরিটি ডিপযিট দিতে হবে এবং তাতে যে পরিমাণ টাকা লাগবে তাতে তাঁর ব্যাঙ্ক একাউণ্টে কুলোবে না। তাঁর মত একজন রিটায়ার্ড ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি ষোল বছর এস. ডি. ও. গিরি করে হাজার-হাজার লোকের সিকিউটির ডিপযিট নিয়েছেন, তাঁরও আবার সিকিউরিটি ডিপযিট? কি অপমানের কথা। খানবাহাদুর সাহেব রাগে গরগর করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, এটাও ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নেতাদের

আরেকটা বদমায়েশী। আচ্ছা, অপেক্ষা কর যাদুধনেরা। খানবাহাদুর সাহেব একবার মেম্বর হয়ে নিন।

যাহোক, এই কারণে খানবাহাদুর খোদাবখশকে শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র নির্বাচনী এলাকাই বেছে নিতে হল। অনেক ভাবনা-চিন্তা অনেক সলা-পরামর্শ এবং জনমত যাচাইর পর খানবাহাদুর সাহেব তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল এবং বাসস্থান এলাকাতেই দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করলেন। এতে প্রতিশ্রুত অন্যান্য এলাকার প্রতি অবিচার করা হল সত্য এবং সেজন্য তিনি মনে-মনে ঐসব অবহেলিত এলাকার নেতাদের কাছে যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করলেন সত্য, কিন্তু মনে-মনে তিনি নিজের এই সিলেকশনে সন্তুষ্ট হলেন। দুটো কারণ এ ব্যাপারে তাঁর সিলেকশনের সহায়তা করল। প্রথম কারণ, নিজের জন্মস্থানের এলাকার লোকগুলো তাঁর পসন্দ হয় না; সেখানকার লোকেরা তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। পক্ষান্তরে এই এলাকায় তিনি একাদিক্রমে তিন বছর এস, ডি, ও. ছিলেন এবং এখান থেকেই তিনি রিটায়ার করেছেন। এ জায়গাটা তাঁর এত পসন্দ হয়েছে যে এখানে তিনি একটা বাড়ী এবং কিছু জমিজমা খরিদ করেছেন। দ্বিতীয় কারণ- এবং এইটাই বড় কারণ, এখানকার সম্ভাব্য ক্যানডিডেটরা সবাই তাঁর বাধ্য অনুগত অনুগৃহীত উকিল মোখতার। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে গেলে এঁরা কেউ দাঁড়াবেন না, সে বিশ্বাস তাঁর আছে। কারণ গত কয়েক বছর ধরে এদের প্রায় সকলেই তাঁকে আইন-সভায় দাঁড়াবার জন্য উৎসাহ-উত্তেজনা দিয়ে আসছেন। এসব লোকের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি অন্যান্য এলাকার তুলনায় সর্বশেষ এবং তাযা-তাযা। আজ যখন সত্য-সত্যই তিনি দাঁড়াতে যাচ্ছেন, তখন অন্তরের সাথে না হোক, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরেও এঁরা কেউ দাঁড়াবেন না। ক্যানডিডেট সরিয়ে আনকনটেস্টেড নির্বাচিত হওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। কে যায় দ্বারে-দ্বারে ক্যানভাস করে ভোট সংগ্রহের ঝুঁকি মাথায় নিতে? নিজের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও এবং পরিণামে নিজের জয় সম্বন্ধে কোনও সংশয় তাঁর না হলেও ভোটারদের কাছে

যাবার আগে তিনি ক্যানডিডেট যাগাবারই চেষ্টা করবেন, এটা তিনি মনের কোণে অতি সংগোপনে ঠিক করে নিলেন।

কাজেই তিনি স্থানীয় উকিল-মোখ্তারদের একদিন নিজের বাড়ীতে চায়ের দাওয়াত করে ঘোষণা করলেন যে শুধুমাত্র তাঁদের অনুরোধ রক্ষার উদ্দেশ্যেই অপর সকল এলাকার পীড়াপীড়ি অনুরোধ ঠেলে এই এলাকায় দাঁড়ান সাব্যস্ত করেছেন।

খানবাহাদুর যদি বুদ্ধিমান লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞ ও হুশিয়ার লোক না হতেন, তবে তিনি সরলভাবে বুঝতেন তাঁর এই ঘোষণায় সবাই খুশী হয়েছেন। কারণ সমবেত উকিল-মোখতারদেরে খুবই উল্লসিত দেখা গেল। তাঁরা বিপুল উল্লাস আনন্দে খানবাহাদুরের যে পরিমাণ চা-বিস্কুট ধ্বংস করলেন, তাতে সাধারণ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারত যে, সমবেত সকলে খানবাহাদুর সাহেবের বিজয়-উৎসবই পালন করছেন। তাঁদের বিস্কুট ভাঙার মড়মড় ও চা চুমকের চুঁচুঁতে এমন বুঝবার কোনও উপায় ছিল না যে, তাঁরা প্রায় সকলেই মনে-মনে বলছিলেন: বেটা, বরাবর আমরাই তোমাকে খাইয়ে এসেছি, একদিনও আমাদেরে ডেকে এক কাপ চা খাওয়াও নি। আজ থেকে তোমার খাওয়াদাবার এবং আমাদের খাবার পালা শুরু।

কিন্তু নিমন্ত্রিত সকলের এমন উল্লাসের মধ্যেও খানবাহাদুর বুঝতে পারলেন ওঁদের মধ্যে যাঁদের দাঁড়াবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁদের মুখের হাসি যেন কেমন শুকনো, তাঁদের কথায় যেমন তেমন আন্তরিকতার জোর নেই। তাঁদের আনন্দ যেন স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

খানবাহাদুর সাহেবের এই সন্দেহ-অবিশ্বাস সব দূর হল যখন সমবেত ভদ্রমণ্ডলির সকলেই একে-একে খানবাহাদুর সাহেবকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে বিদেয় হলেন।

সকলে চলে যাওয়ার পর খানবাহাদুর সাহেব সমস্ত কথা-বার্তার পর্যালোচনা করে দেখলেন যে তাঁর কোনও আশঙ্কা নেই। প্রসপেকটিভ ক্যানডিডেটরা যে প্রথম চোটেই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ করতে পারে নাই,

এটাও খুবই স্বাভাবিক। বেচারারা আশা করেছিল, তারা মেম্বর হবে; সেই মেম্বরির উপর কত স্বপ্ন-রাজ্য তারা রচনা করেছিল। খানবাহাদুর সাহেবের অবতরণে আজ তাদের সেই স্বপ্ন-রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। খানবাহাদুর সাহেব কার্যতঃ তাদের পাতের বাড়া-ভাত খেয়ে ফেললেন। বেচারারা একটু কষ্ট পাবে না? এটা ত খুবই স্বাভাবিক। আহা! বেচারাদের জন্য খানবাহাদুরের মনে একটু দুঃখও হল।

কিন্তু এটা ত দুঃখ-সহানুভূতির প্রশ্ন নয়। এটা যোগ্যতার প্রশ্ন, এটা অভিজ্ঞতার কথা, এটা দেশ-শাসনের মত জটিল ব্যাপার। এখানে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা করলে চলবে না।

অল্পক্ষণেই খানবাহাদুর সাহেবের মন থেকে ঐ সব নিরাশ প্রার্থীর ব্যথা-বেদনার ভাবনা দূর হয়ে গেল।

যথাসময়ে নমিনেশন পেপার দাখিল হয়ে গেল।

ভক্ত-সমর্থক বন্ধু-বান্ধব ও কর্মীরা সমবেতভাবে এবং পৃথক-পৃথক যে খরচের ইষ্টিমেট দিলেন, তাতে খানবাহাদুর সাহেবের চক্ষু জীবনের প্রথম চড়ক গাছ হয়ে গেল। খরচের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি দুটো। প্রথম আপত্তি এই: স্থানীয় নেতাদের অনুরোধে তিনি শুধু পাবলিকের খেদমত করবার জন্যই ক্যাণ্ডিডেট হয়েছেন, নিজের ইচ্ছায় নিজের স্বার্থের জন্য হননি। অন্যান্য যে সব এলাকার লোককে তিনি বঞ্চিত করেছেন, ঐ সব এলাকায় দাঁড়ালে খরচের কোনও প্রশ্নই উঠত না। দুর্ভাগ্য এই যে নমিনেশন পেপার দাখিল করবার তারিখ চলে গেছে। দ্বিতীয় আপত্তি: এই খরচের পরিমাণ বেশী-বেশী ধরা হয়েছে। অত টাকা লাগতেই পারে না।

ইষ্টিমেট-দাতারা অর্থাৎ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এর জবাব দিলেন। প্রথমতঃ অন্যান্য সব কাজের মতই ইলেকশনেও খরচ লাগেই। নিজের ইচ্ছায় দাঁড়ালেও লাগে, পরের অনুরোধে দাঁড়ালেও লাগে। খানবাহাদুর সাহেব অন্যান্য এলাকায় দাঁড়ালেও খরচ লাগতই। দ্বিতীয়তঃ ইষ্টিমেট বেশী করে ত ধরা হয়ই নাই, বরঞ্চ খুবই কম ধরা হয়েছে। এটা

সম্ভব হয়েছে শুধু খানবাহাদুর সাহেব বলে এবং এলাকার লোক তাঁকে চায় বলে। অন্য লোক হলে অথবা খানবাহাদুর সাহেব অন্য এলাকায় দাঁড়ালে এর চার ডবল খরচ লাগত। বস্তুতঃ এটা লোয়েস্ট মিনিমাম। এর এক পয়সাও কমান যাবে না। ইষ্টিমেট-দাতারা সব সাধু-লোক বলেই গোড়াতেই খাঁটি হিসাবে দিয়েছেন। অন্য লোক হলে গোড়াতে কম হিসেব দিয়ে খানবাহাদুর সাহেবকে কাজে নামিয়ে তারপর আস্তে-আস্তে ক্রমে খরচের নতুন-নতুন এবং বড়-বড় আইটেম বের করত। কিন্তু ইষ্টিমেট-দাতারা তেমন লোক নন।

তর্কের সময় এটা নয়। কাজ বাগাবার সময়। এটা ঝগড়া করার সময় নয়, এখন বিরোধ বাধিয়ে খানবাহাদুরের কোনও লাভ হবে না, এটা তিনি বুঝলেন। কাজেই তিনি হাকিমী মেযাজ ছেড়ে নরম সুরে বললেন: আপনাদের ইষ্টিমেট আমি ডিসপুট করছি না। ইলেকশন হলে কিছু টাকা লাগবে এটা মানি। কিন্তু ইলেকশন হবে কেন? আনকনটেস্টেড হবার কথা ত? যাঁরা ক্যানডিডেট হয়েছেন, তাঁদের কাছে যান। আমি নিজেই যখন ক্যানডিডেট হয়েছি, তখন তাঁদের আর থাকার কথা নয়। ও-কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিন।

ইষ্টিমেট-দাতারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বললেন: সে চেষ্টা আমরা করছি, করেই যাব। কিন্তু তাতেও খরচা দরকার।

খানবাহাদুর: সেটা কেমন?

স্থানীয় নেতা: প্রথমেই সকলে রাযী হবে না। জনমত গঠন করে পাবলিকের প্রেশার দিয়ে তাঁদেরে উইথড্র করতে বাধ্য করতে হবে। জনমত গঠন করতে সভাসমিতি করা দরকার, প্রচার-প্রপাগ্যাণ্ডা দরকার। এসব করতে কর্মী, লেখক, গায়ক ও ভলান্টিয়ার দরকার।

খানবাহাদুর: তবে ত ইলেকশনই করা হল। ক্যানডিডেটদের সাথে আপোষ করা হল কই?

নেতা: ইলেকশন ত আরও অনেক পরের কথা স্যার। তাতে ত অনেক খরচা লাগবে। এখন আমরা বলছি ক্যানডিডেট উইথড্র

করাবার কথা। ঐভাবে জনমত গঠন করে পাবলিককে দিয়ে অন্যান্য ক্যানডিডেটদেরে মানে যারা আপনার-আমাদের অনুরোধে এই মুহূর্তে উইথড্র করবে না সেই সব ক্যানডিডেটদেরে, জোর করে উইথড্র করাতে হবে। তারপর স্বেচ্ছায় করুক আর অনিচ্ছায় করুক, এখন করুক আর পরেই করুক, যারাই উইথড্র করবে, তাদেরেই কিছু টাকা-কড়ি দিতে হবে। তারা বলবে, ইতিমধ্যে তারা বেশ-কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছে।

খানবাহাদুর দেখলেন, উভয় সংকট। যেদিকে যান টাকা খরচ করতেই হবে। তিনি বিরক্তি গোপন করবার চেষ্টা করে বললেন: জনমত নতুন করে গড়তে হবে কেন? আপনারা ত বলেছিলেন: সেন্টপার্সেন্ট পাবলিক আমাকেই চায়। তবে আর সভা-সমিতি করে পাবলিক প্রেশারের আয়োজন করতে হবে কেন:

নেতা: পাবলিক আপনাকে আগেও চাইত এখনও চায়। কিন্তু তাদের কাছে কথাটা পৌঁছাতে হবে ত? আপনার বিরুদ্ধে কে কে দাঁড়িয়েছে, কে কে আপনার খেলাফে কাজ করছে, চক্ষে আংগুল দিয়ে পাবলিককে তা দেখিয়ে দিতে হবে ত। পাবলিককে এদের বিরুদ্ধে অর্গ্যানাইয করতে হবে না?

খানবাহাদুর দেখলেন, কথাটা সত্য। ঐ সংগে এটাও তিনি আরও ভাল করে বুঝলেন যে ভোটারদের কাছে না গিয়া ক্যানডিডেটদেরেই বাগানো দরকার। তিনি বললেন: আপনারা বলছেন, ক্যানডিডেটদেরে উইথড্র করাতে কিছু-কিছু টাকা তাদেরে দিতে হবে। সবাইকে উইথড্র করাতে কত লাগবে মনে করেন?

সকলে হিসাব করতে লেগে গেলেন। ক্যানডিডেট দাঁড়িয়েছে মোট-মাট সাত জন। এদের মধ্যে স্ক্রুটিনিতে যারা টিকবে শুধু তাদেরেই ট্যাক্‌ল করতে হবে। কাজেই খানবাহাদুর স্ক্রুটিনি পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রস্তাব করলেন। জবাবে স্থানীয় নেতারা প্রস্তাব করলেন, ইতিমধ্যে প্রচার ও সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। স্বভাবতঃই উভয় প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

কিন্তু স্ক্রুটিনিতে বিশেষ লাভ হল না। খানবাহাদুরের উত্তরাধিকারী এস. ডি. ও. সাহেবই স্ক্রুটিনির হর্তা-কর্তা রিটার্নিং অফিসার। খান-বাহাদুর স্ক্রুটিনির আগের রাত্রে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করলেন। কিন্তু ফল যা হল, তা না হলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ সাতজন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজনের নাম কাটা গেল। খানবাহাদুর সহ ছয়জন প্রার্থী টিকে গেলেন। খানবাহাদুর তাঁর উত্তরাধিকারী তরুণ এস. ডি. ও.র ব্যবহারে খুবই দুঃখিত হলেন এবং মন্তব্যও করলেন যে আজকালকার তরুণ অফিসাররা বে-আদব ও মাথা-গরম। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত এই পাঁচজন প্রার্থীকেই ট্যাক্‌ল করে বিনা যুদ্ধে মেম্বর হাওয়ার চেষ্টায় লেগে গেলেন। তাঁর লোকজন এই উদ্দেশ্যে প্রার্থীদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগলেন।

প্রার্থীদের মধ্যে একজন মুসলিম লীগ ও একজন কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থী। মুসলিম লীগ নেতারা অবশ্য তাঁদের মনোনীত প্রার্থী ঠিক করার আগে খানবাহাদুর সাহেবকে লীগ-টিকিট নেবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু খানবাহাদুর সাহেব দলাদলি ও পার্টিবাজিতে বিশ্বাস করেন না বলে এবং নিজের যোগ্যতার জোরেই নির্বাচিত হয়ে যাবেন এই দাবিতে মুসলিম লীগের অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। কৃষক-প্রজা পার্টি সরকার-বিরোধী বিপ্লবী ছদ্ম কংগ্রেসী দল বলে তিনি এমন সব কথা আগে থেকেই প্রকাশ্যভাবে বলতেন যে কৃষক-প্রজা পার্টির কোনও লোক খানবাহাদুর সাহেবকে ঐ পার্টির টিকিট নেবার কথা বলতেই সাহস পান নি।

খানবাহাদুর সাহেবের লোকজনের কাছে শর্তস্বরূপ অপর তিন প্রার্থী যে টাকা দাবি করলেন, লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা দাবি করলেন তার তিনগুণ। তাঁদের যুক্তি এই: একদিকে পার্টি টিকিট পাওয়ায় তাঁদের জেতবার সম্ভাবনা বেশী, অপরদিকে খান-বাহাদুরের টাকা খেয়ে উইথড্র করলে পার্টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বদনাম কামাই করতে হবে বলে তাঁদের রিস্কও বেশী। কিন্তু

যত বেশী, ক্ষতিপূরণ তত বেশী হওয়া দরকার। যারা কোন পার্টির মনোনয়ন পায়নি, তাদের জেতবার কোনও চান্সও নেই, তাদের বদনামের রিস্কও নেই। তারা আসলে সিরিয়াস ক্যানডিডেটই নয়। ধনী প্রতি-দ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে শেষ পর্যন্ত সরে পড়বার মতলবেই তারা ক্যানডিডেট হয়ে থাকে।

এইভাবে সকল ক্যানডিডেটের সাথে দেন-দরবার করে হিতৈষীরা যে টাকার ইস্টিমেট দিলেন, তাতে খানবাহাদুর বলতে বাধ্য হলেন: এত টাকা আমি দিতে পারব না।

বন্ধুরাও বললেন: সত্যিই ক্যানডিডেটদের দাবি অন্যায়। এর অর্ধেক টাকায় আমরা আপনার ইলেকশন করিয়ে দেব।

খানবাহাদুর সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন: ইলেক-শন করিয়ে দেবেন মানে? পাশ করিয়ে দিবেন না?

বন্ধুরা বললেন: সে একই কথা হল।

খানবাহাদুর কর্মীদলসহ ইকেলশন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

৪

কাজে নেমে খানবাহাদুর বুঝলেন, একবার যুদ্ধে নেমে পড়লে খরচা কনট্রোল করাও যায় না, খরচার ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে আসাও যায় না। সুতরাং টাকা প্রচুর খরচ হতে লাগল। তবে সান্ত্বনা এই যে টাকার ফলও তিনি পেতে লাগলেন। যেখানেই যেতে লাগলেন, কর্মীরা তাঁকে বিরাট-বিরাট অভ্যর্থনা দেওয়াতে লাগল। গাড়ী চলা-ফেরার রাস্তার অভাবে খানবাহাদুর সাহেব স্বভাবতঃই গ্রামে-গ্রামে যেতে পারলেন না। কিন্তু বড়-বড় বাজার-বন্দর যাতে গাড়ীতে যাওয়া যায়, তার সব জায়গায়ই তিনি গেলেন। কর্মীদের উদ্যোগে খানবাহাদুরের নিজের টাকায় সব জায়গায় তাঁর জন্য পোলাও-কোর্মা ও অভিনন্দন-পত্রের ব্যবস্থা হতে লাগল। স্থানীয় স্কুল-মাদ্রাসায় মোটা চাঁদা দিবেন, কর্মীদের পরামর্শে তিনি এমন ওয়াদাও করতে লাগলেন। অনেক জায়গাতেই স্থানীয় নেতারা

বললেন ঃ ঐ অঞ্চলের জন্য কোনও চিন্তা করতে হবে না। খানবাহাদুর সাহেবর তথায় আসবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

অধিকাংশ অঞ্চল হতেই এই একইরূপ আশ্বাস পেয়ে খানবাহাদুর বুঝতে পারলেন, তিনি এস. ডি. ও. থাকতে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন, আজও তেমনি আছেন, বরঞ্চ এখন যেন কিছুটা বেশী হয়েছেন। সরকারী চাকুরি হাওয়ার পর এ দেশবাসী অফিসারদেরে আর মান্যগণ্য করে না, এ ধরনের অভিযোগ যারা করে, তারা দেশবাসীর প্রতি অবিচার করে থাকে।

কিন্তু নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসতে থাকল, খানবাহাদুরের নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনা ততই সন্দেহজনক হয়ে উঠতে লাগল। রোজ দশ-বিশজন স্থানীয় নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মী দশ দিক থেকে দশ বিশ রকমের দুঃসংবাদ আনতে লাগল। সবাই বলতে লাগল ঃ বিরুদ্ধ পক্ষ দেদার টাকা খরচ করে ভোটার ভাগিয়ে নিচ্ছে। এমন কি, বেশী বেতন দিয়ে কর্মী পর্যন্ত ভাগিয়ে নিচ্ছে। যে গ্রামের শতকরা একশটা ভোটই খানবাহাদুর সাহেবের পক্ষে ছিল, এখন তার প্রায় অর্ধেক বিরুদ্ধ পক্ষে চলে গিয়েছে।

এর প্রতিকার কি? আরও টাকা। অগত্যা খানবাহাদুর আরও টাকার থলির মুখ খুললেন। যত দিন যেতে লাগল, প্রয়োজনও ততই বেড়ে যেতে লাগল! তিনি যত বেশী টাকা দিতে লাগলেন, টাকার দাবিও ততই বাড়তে লাগল। তিনি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। এভাবে টাকা খরচ করলে এক ইলেকশনেই যে তিনি ফতুর হয়ে যাবেন! অনেক সময় রাগ করে বলেও ফেলেছেন, সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু সত্যি সত্যি সরে দাঁড়ালেন না। কারণ এ বিশ্বাস তার আগের মতই অটুট থাকল যে, ভোটার জনসাধারণ এখনও তার পক্ষেই আছে। শুধু নেতা ও কর্মিগণই তাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছে। খানবাহাদুর এটা বুঝলেন বটে কিন্তু এদের শত্রু করতেও তিনি সাহস পেলেন না। অতএব তাদের দাবি যথাসাধ্য মেনে চলতে লাগলেন।

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে স্বভাবতঃই অনেকেই খানবাহাদুর সাহেবের পরিচিত ছিলেন। তাঁদের কেউ-কেউ খানবাহাদুর সাহেবের ভক্তও ছিলেন। এ'দেরই দু-একজনের মুখে খানবাহাদুর সাহেব একটু-আধটু করে শুনতে লাগলেন যে নির্বাচনে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থীর মধ্যে। সেখানে খানবাহাদুর সাহে-বের নামও নেই।

প্রথম-প্রথম খানবাহাদুর কথাটা উড়িয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ একই কথা শুনতে-শুনতে তিনি অবশেষে খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একদিন কাউকে খবর না দিয়ে তিনি এলাকার প্রধান-প্রধান কেন্দ্র তদারক করতে একা-একা বের হলেন। আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল তাঁর! যেখানেই মোটর থামালেন সেখানেই ভিড় হল। যেখানে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে ভোটের কি অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন, সেখানেই সকলে একবাক্যে বলল, সব ভোট তিনি পাবেন। আর যেখানে নিজের পরিচয় গোপন করে খোঁজ করলেন, সেখানেই তিনি জানতে পারলেন, লোকেরা হয় মুসলিম লীগ নয় কৃষক-প্রজা পার্টির কথা বলে; তাঁর নিজের কথা কেউ বলে না।

এটা কি? কেন এমন হল? তিনি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। লোকেরা তবে কি মনের কথা তাঁর কাছে গোপন করছে? তাঁর সমর্থকরাও কি তবে তাই? তিনি চিন্তিত হয়ে শহরে ফিরলেন।

এইশহরও তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যেই। তিনি শহরের কর্মীদেরে ডেকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। আশ্চর্য। ওরাও স্বীকার করল, তারা এই খবর আগেই পেয়েছে। তাদেরও বিশ্বাস, মফস্বলের কোনও ভোট খান বাহাদুর পাবেন না। শহর ও শহরতলির ভোটই খান বাহাদুর সাহেবের একমাত্র ভরসা। হাজার হলেও এখানকার ভোটাররা শিক্ষিত ত। এরা বিদ্যার মর্ম বুঝে। পাড়াগাঁয়ের মূর্খেরা বিদ্যার মর্যাদা কি বুঝবে?

তবে উপায় কি? একমাত্র উপায় শহর ও শহরতলির কুলে ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত করা। মফস্বলের ভোটাররা সকলেই খানবাহাদুরের

৯—

বিরোধী হলেও কিছু এসে যায় না। কারণ সেখানকার ভোটারের শতকরা কুড়িজনও ভোট দিতে যাবে না। খানবাহাদুর সাহেব যদি শহর ও শহরতলির শতকরা এক শ না হোক নব্বইজন ভোটারকে কেন্দ্রে উপস্থিত করাতে পারেন, তবে এক শহরের ভোট দিয়েই তিনি জিতে যাবেন। শহরে ও শহরতলিতে ঘন বসতি। শুধু এখানকার ভোটার সংখ্যাই সারা মফস্বলের মোট ভোটার-সংখ্যার অর্ধেকের বেশী। খানবাহাদুর সাহেবের এখন এটা অবশ্যই করা উচিৎ। কর্মীরা জান দিয়ে দিবে এ কাজে। কারণ এ সংগ্রাম শুধু খানবাহাদুর সাহেব ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সংগ্রাম নয়, আসলে এ সংগ্রাম শহর ও মফস্বলের সংগ্রাম, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংগ্রাম। এ সংগ্রামে খানবাহাদুর হারলে সে পরাজয় হবে মফস্বলের কাছে শহরের পরাজয়, অশিক্ষিতের কাছে শিক্ষিতের পরাজয়। এটা কর্মীরা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করবে না।

কথাটা খানবাহাদুর সাহেবের পসন্দ হল। কর্মীদের দিবারাত্র পরিশ্রমের ফলে ভোটারদেরে ভোটকেন্দ্রে আনার জন্য দুই শ টাকা করে দশখানা বাস এক দিনের জন্য ভাড়া করা হল।

যথাসময়ে নির্বাচনের দিন এল। খানবাহাদুরের বাসগুলি স্পেশাল ডিযাইনের ব্যাজ-পরা ভলান্টিয়ারদের নেতৃত্বে সকাল থেকে ভোট-কেন্দ্রে ভোটার আনা-নেওয়া করতে লাগল। স্বয়ং খানবাহাদুর সাহেব শহরের ভোটকেন্দ্রে বসে অনেকক্ষণ তামাশা দেখলেন। কর্মীদের কর্মোদ্যমে, নেতাদের দৌড়াদৌড়িতে তিনি পুলকিত হলেন। তিনি দেখলেন, মুহূর্তে-মুহূর্তে তাঁর বাসগুলি ভোটার বোঝাই করে আসছে। তাদেরে নামিয়ে দিয়ে আবার ভোটার আনতে ভোঁ-ভোঁ করে চলে যাচ্ছে। ভোটকেন্দ্রে খানবাহাদুরের তাঁবু খাটান হয়েছে। সেখানে ভলান্টিয়াররা ভোটারদেরে খানবাহাদুরের টাকায়-কেনা শরবত-পান-বিড়ি-সিগারেট খাওয়াচ্ছে। খানবাহাদুর সাহেবকে স্থানীয় নেতা একবার তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। বললেন: ইনিই আমাদের খানবাহাদুর সাব।

সকলে দাঁড়িয়ে খানবাহাদুরকে সালাম করল। নেতা বললেন:

এদের সম্বন্ধে আপনার কোনও চিন্তা করতে হবে না। আপনি বরঞ্চ অন্য কেন্দ্র পরিদর্শন করে আসুন।

তিনি খুশী হয়ে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে কেন্দ্র থেকে বের হলেন। সমবেত ভোটার দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে মফস্বলের ভোট না পেলেও তিনি পাশ করে যাবেন। তবু একবার মফস্বলের দু-একটা কেন্দ্র দেখে আসলে মন্দ হয় না। তিনি মফস্বলের ভোট পাবেনই বা না কেন? ওদের কত উপকার তিনি করেছেন। ওদের কত অভিনন্দন তিনি পেয়েছেন।

গেলেনও তিনি দু-একটা কেন্দ্রে। ব্যালটে ভোট হচ্ছে। তিনি নিজে কিছু বুঝলেন না। কিন্তু যেখানেই তাঁর পরিচয় জানাজানি হয়ে গেল, সেখানেই তিনি শুনলেন, সব ভোট একচেটে তাঁরই পক্ষে হচ্ছে। কিন্তু সব প্রার্থীর সমর্থকরাই একচেটে ভোট পাচ্ছে দাবি করায় তিনি বিভ্রান্ত হয়ে শহরে ফিরে আসলেন।

শহরের কেন্দ্রে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখানে তখন ভোট প্রায় শেষ। তাঁর কর্মীরা জানাল: একচেটে সব ভোট তাঁর পক্ষেই হয়েছে।

৫

যথাসময়ে নির্ধারিত দিনে ভোট গণনা হয়।

খানবাহাদুর হেরে গেছেন। তাঁর যামানতের টাকা বাযেয়াফত হয়েছে। অনেক কেন্দ্র থেকেই তাঁর বাক্স খালি এসেছে। ব্যালট-পেপারের বদলে কোনও-কোনও বাক্সে ছেঁড়া জুতোর টুকরো, কোনও বাক্সে কাগযে-মোড়া বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি ময়লা-আবর্জনা। এমন কি শহর কেন্দ্রের বাক্সেও তাঁর চার-পাঁচ শর বেশী ভোট হয় নি। এই কেন্দ্রে তিনি যে সংখ্যক ভোট পেয়েছেন, সরকারী কর্মচারী ও উকিল-মোখ

তারদের ভোট-সংখ্যাও তার চেয়ে বেশী। এঁরাও তবে সকলে খান-বাহাদুর সাহেবকে ভোট দেননি! আর ঐ বাস ভর্তি করে যে ভোটারগুলো আনা হল, তাদের ভোটই বা গেল কোথায়?

ফেরার পথে একজন স্থানীয় নেতার সাথে আচানক খানবাহাদুরের দেখা হয়ে গেল। তিনি রাগে বললেন: কি সাব? আপনার এলাকার কোনও ভোট তা হলে আমায় দেন নি?

নেতা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: বলেন কি স্যার? আমার এলাকার উনিশ শ ভোটের একটাও আপনার বাক্স ছাড়া আর কোথাও যায়নি। আমি একটা-একটা করে গনে-গনে ভোট দিইয়েছি।

খানবাহাদুর: আপনি একাই উনিশ শ ভোট দেওয়ালেন। আর সারা এলাকা থেকে ভোট পেলাম আমি ছয় শ তিপ্পান্ন। বাকী ভোট তবে গেল কোথায়?

নেতা: কি বলব স্যার? আজকাল ঠিকমত ভোট দেবার কি কোনও জু আছে? দিলাম একজনকে, গণনা হল আরেক জনের নামে? নিশ্চয় অপর পক্ষ বাক্স ভেঙেছে স্যার। আপনি মামলা করুন; হাজার ভোটারকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াব।

রাগে গর-গর করতে-করতে খানবাহাদুর পথ চললেন। খানিকদূর যেতেই আরেক জন নেতার সাথে দেখা। খানবাহাদুর তাঁকে বললেন: কি প্রেসিডেন্ট সাব, আপনার এলাকার একটা ভোটও ত আমাকে দেন নি।

প্রেসিডেন্ট: স্যার, আমি ত অন্য লোকের মত দুমুখো মুনাফেক নই। আমি ত স্যার প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলাম আমার অঞ্চলে আপনার যাওয়ায় কোনও ফল হবে না।

খানবাহাদুর রূঢ়স্বরে বললেন: আপনি ওকথা বলেন নি, আপনি বলেছিলেন: আমার এলাকার ভোট সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

প্রেসিডেন্ট হেসে বললেন: ও একই কথা হল স্যার।

খানবাহাদুর বিড়বিড় করে প্রেসিডেন্টকে গাল দিতে-দিতে বাসায় ফিরলেন।

পরদিন সকালে বৈঠকখানায় বসে খানবাহাদুর ভক্তদের মাঝে সদম্ভে বললেন : এখন বুঝলে ত আমার কথাই ঠিক ? এ দেশবাসী আজো ভোটাধিকার পাবার যোগ্য হয় নি। এখানে স্বরাজ-স্বাধীনতার কথা বলা বাতুলতা মাত্র।

তারও পরের দিন তিনি সরকারী চাকুরীতে রিএমপ্লয়মেন্টের তদবিরের জন্ম কোলকাতার গাড়ী ধরলেন।

বৈশাখ, ১৩৪৪

রাজনৈতিক বাল্য শিক্ষা

১ম ভাগ—বর্ণ পরিচয়

কেবলমাত্র রাজনৈতিক শিশুদের জন্য লিখিত

বয়স্করাও পড়িতে পারেন কিন্তু গোপনে

(দুধের) স্বরবর্ণ

অ— অন্যের ভালমন্দের পরোয়া করিও না ; নিজের লাভ-লোকসান আগে দেখিও।

আ— আমদানী রফতানীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে আমদানী মানে আমার পকেটে আমদানী ; রফতানী মানে তোমার পকেট হইতে রফতানী।

ই— ইহকালে ইলেকশন বৈতরণী পার হইতে পারিলে পরকালে পোলসিরাতের ভাবনা থাকিবে না। অতএব ইউনিয়নবোর্ড হইতে হাত-সাফাই কর।

ঈ— ঈমান যদি বাঁচাইতে চাও, তবে ক্ষমতায় আসীন (উলিল-আমর) দলের তাবেদারি কর।

উ— উপকার যত পার গ্রহণ করিও ; কদাচ দান করিও না।

ঊ— ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিও ; অন্তত কিছু দূর উঠিতে পারিবেই।

ঋ— ঋণ করিয়া মেম্বর-মন্ত্রী হও। দেনা আর শোধ করিতে হইবে না।

এ— এন্টি-কোরাপশন পোস্ট-কোরাপশন নয়। অর্থাৎ ওটা কোরাপশনের আগের ব্যাপার। একবার কোন মতে কোরাপশন করিয়া ফেলিলে এন্টি-কোরাপশনের আর ভয় নাই।

নিতান্তই অনাবশ্যক। কারণ পাকিস্তানের সাথে খেতাবের কোনো বিরোধ নেই। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও একথা লেখা নেই যে পাকিস্তানে খেতাব থাকবে না। বিশেষ করে নবাব, খানবাহাদুর, খানসাহেব এগুলি সবই মুসলমানী খেতাব। এগুলি ইসলামী তমদ্দুন ও মুসলিম ঐতিহ্যের নিদর্শন। এসব খেতাবে ইসলামেরই শান-শওকত ও রওনক বৃদ্ধি হচ্ছে। ইংরাজ রাজত্বে মুসলমানের আর সবই গেছে। থাকবার মধ্যে আছে মাত্র এই কয়টি মুসলমানী খেতাব। এই খেতাব বর্জনের প্রস্তাব করে লীগের বোম্বাই বৈঠক বেআইনী ও ইস্‌লাম-বিরোধী কাজই করেছেন। মুসলিম জাতির জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা কিছুতেই ঠিক হয় নি।

একজন বাধা দিয়ে বললেন: তবে কি আপনার মত এই যে সার, রাজা ও মহারাজা প্রভৃতি খেতাব ইসলামী নয় বলে শুধু ওগুলো বর্জন করা যেতে পারে?

সকলের দৃষ্টি বক্তার দিকে পড়ল।

খানবাহাদুর সাহেব সভাপতির দিকে চেয়ে বললেন: অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার সার। ইনি খানবাহাদুরি খেতাব ছেড়ে দিয়েছেন বলে খবরের কাগযে খবর বেরিয়েছে; অতএব তিনি খানবাহাদুর না হওয়ায় এই সভায় যোগ দেবার তাঁর কোন 'লোকাস্‌ স্টাণ্ডি' নেই।

সভাশুদ্ধ সকলে শেম-শেম করে উঠলেন।

কিন্তু কিছুমাত্র না দমে বক্তা বললেন: আমি খানবাহাদুরি ছেড়েছি বলে লীগ-সভায় বলেছি সত্য কিন্তু লাট সাবের সেক্রেটারির কাছে জাবেদাভাবে পদত্যাগ-পত্র আজও দেই নি। অতএব আমি আজও একজন খানবাহাদুর রয়েছি।

উভয় পক্ষের কথা শুনে সভাপতি খানবাহাদুর সাহেবের পয়েন্ট-অব-অর্ডারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বললেন: চাকুরিতে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেই চাকুরিয়ার দায়িত্ব শেষ হল না; যতদিন তার পদত্যাগ-

ঝ— ঝড়-ঝঞ্ঝা যে মাঝে-মাঝে হয়, তা' আল্লার গজবের ঝাপ্টা নয়— রহমতের ঝর্ণা। কারণ তাতে রিলিফ কার্যের সুবিধা হয়।

ট— টেণ্ডার দিলেই কন্ট্রাক্ট পাওয়া যায় না; টিপও দিতে হয়।

ঠ— ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় করিবার ঠাট দেখাইও না। কারণ তাতে মেজরিটিকে ঠাট্টা করা হয়।

ড— ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উপর ডাট নজর রাখিও; কারণ ওখানেই রাজনৈতিক পরীক্ষার ডবল প্রমোশন হয়।

ঢ— ঢাক পিটাইবার লোক রাখিও; কারণ প্রপ্যাগাণ্ডা পাবলিসিটি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইলেও তার ঢোল বাতাসে বাজে না।

ত— তহবিল কখনো তছরুপ হয় না; হাত ফেলিতে তোমারটা আমার হয় মাত্র।

থ— থলিয়া জগতে মাত্র একটি, সেটি আমার থলিয়া। ওটি ভরিলেই দুনিয়া ভরিল।

দ— দল বা পার্টি মানে একই উদ্দেশ্যে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া,— যথা জয়েন্ট স্টক কোম্পানী। স্টক যদি জয়েন্ট না থাকে, তবে দলত্যাগ করিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিও না।

ধ— ধন মানে দওলত, দওলত মানে রাজত্ব। রাজত্বের মালিক রাজা। কিং ক্যান্ ড্ নো রং। অতএব ধনীর কোনো অপরাধ নাই।

ন— নিজামে ইসলামের কথায় মুখে খই ফুটাইও; ইসলামের পন্থা বাদ পড়িলেও নিজামের পন্থা বাদ পড়িবে না।

প— পারমিটের পরিকল্পনা যতদিন আছে, ততদিন পাটের দাম না থাকিলেও চলিবে। কারণ পারমিটটা তোমার; আর পাটটা কৃষকের।

ফ— ফটকা বাজার বাঁচাইয়া রাখিও। গদি যদি নিতান্তই হাত-ছাড়া হয়, তবে ওখানেই কপাল ফাটিবে।

ব— ব্যালট বাক্সে বিশ্বাস রাখিও না, বাস্তব বুদ্ধি অনুসারে বাজেটের ব্যবস্থা করিও।

ভ— ভোট একটা কাঁচা মাল। যে দামেই কিন না কেন, ঠিকমত ফিনিশ করিতে পারিলে উচ্চ লাভে বিক্রয় করিতে পারিবে।

ম— মন্ত্রী হইতে চাহিলে আগে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে হাত মকশ কর।

য— যন্ত্র-যান যত পার আজই কিনিয়া লও; হায়াত মওত আল্লার হাতে। যশঃ ও যম যমজ-ভ্রাতা। তারা ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

র— রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইলে আমাদের কোনো অসুবিধা হইবে না; কারণ ছেলেবেলা হইতেই বাড়ীর পাশের জঙ্গলে 'ক্যা হুয়া' 'ক্যা হুয়া' শুনিয়া আসিতেছি।

ল— লবণের সের ষোল টাকা হওয়ায় কি আর এমন অসুবিধা হইয়াছে? লবণ না হইয়া চাউলের সের ষোল টাকা হইত তবেই অসুবিধা হইত। কারণ চাউলের চেয়ে লবণ অনেক কম লাগে।

শ— শাসন যারা করিতে জানে, তাদের কোনো শাসনতন্ত্র লাগে না। যেমন চিনা বামুনের পৈতা লাগে না।

ষ— ষড়দর্শন মানে ঢাকা দর্শন, করাচি দর্শন, লণ্ডন দর্শন, ওয়াশিংটন দর্শন, লেক সাকসেস দর্শন এবং বাড়ী ফিরিবার পথে মক্কা দর্শন।

স— সরকার যখন জাতীয় সঞ্চয়ের (ন্যাশনাল সেভিং-এর) কথা বলেন, তখন স্মরণ রাখিও, তুমিও জাতির অংশ; অতএব তোমার আয়ই জাতির সঞ্চয়।

হ— হতাশ রাজনীতিকরাই ইলেকশনের জন্য হৈ চৈ করিয়া থাকে। হতভাগাদের কথায় হাঙ্গামা করিও না। হতবাক্ হইতে হইবে।

ং— নিজ বংশধরের অংশ সংগ্রহে অপর অংশীদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অথবা দেশ ধ্বংস করিতে কদাচ শংকা করিও না।

ঃ— দুই হরফের মধ্যে বিসর্গ বসিলে পরের হরফের শক্তি ডবল হয়। অতএব তোমার পুত্রকে তোমার চেয়ে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ করিতে চাহিলে বাপ-বেটার মধ্যে একটা বিসর্গ বসাও।

*— চন্দ্রবিন্দু মানে চাঁদের ফোটা। চাঁদ থাকে আসমানে। ফোটার স্থান কপালে অথচ চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ নাসারন্ধ্রে। অতএব তোমার নাকের উচ্চতা থাক না থাক, ঘ্রাণ-শক্তি থাকিলেই হইল।

১৪ই আগস্ট, ১৯৫২

রাজনৈতিক ব্যাকরণ

হ্যারল্ড লাস্কির গ্রামার-অব-পলিটিক্স

ও

ডাঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লার প্রথম বাংলা ব্যাকরণের

খামিরা মিশাল বিয়াকরণ

১। মনুষ্য জাতি যে আচরণের দ্বারা রাজ-দরবারে নীত হয় এবং তথায় গোপাল ভাঁড়ের মত সাফল্যের সাথে মনের ভাব গোপন রাখিয়া রাজা-প্রজা উভয় পক্ষকে ফাঁকি দিতে পারে তাকে রাজনীতি বলা হয়। রাজনীতি মোটামুটি তিন প্রকার: (ক) রাজা (বাদশা)-নীতি, (খ) রাজ (সরকার)-নীতি; (গ) রাজ (মিস্ত্রি)-নীতি। 'ক'-এ সৈন্য-বাহিনী, 'খ'-এ কর্মী-বাহিনী ও 'গ'-এ যোগালিয়া-বাহিনী দরকার। রাজা সৈন্য-বাহিনীকে ফাঁকি দিয়া রাজকোষের টাকা বিদেশে পাঠাইবেন, যাতে দেশে বিপ্লব হইলে বিদেশে গিয়া আরামে দিন যাপন করিতে পারেন। রাজনীতিক মন্ত্রী কর্মী বাহিনীকে ফাঁকি দিয়া সরকারী টাকায় নিজের শিল্প-কারখানা ও বাড়ীঘর করিবেন, যাতে মন্ত্রিত্ব গেলেও আরামে বাড়ী বসিয়া খাইতে পারেন। রাজমিস্ত্রি যোগালিয়া বাহিনীকে ফাঁকি দিয়া একের মাল-মশলা দিয়া অপরের দালান নির্মাণ করিবেন, যাতে কাজ পাওয়া না গেলেও কিছুদিন চলিতে পারে।

যে শাস্ত্র জানিলে রাজনীতি শুদ্ধরূপে করিতে, বলিতে ও লিখিতে পারা যায়, তাকে রাজনীতির ব্যাকরণ বলা হয়।

২। ভাষার ব্যাকরণের ভিত্তি তিনটি: শব্দ, বাক্য ও পদ। রাজনীতিক ব্যাকরণেও তাই। তবে এক্ষেত্রে ঐ তিনটি ভিত্তির বাস্তব রূপ এই:

শব্দ— অর্থহীন আওয়াজকে শব্দ বলে। এই শব্দ যত বেশী মোটা, ভারি, উচা, বুলন্দ ও কর্ণভেদী হয়, তত বেশী শুদ্ধ হয়। গলার আওয়াজে না কুলাইলে মাইক ব্যবহার করিবে।

বাক্য— যে সমস্ত শব্দ দ্বারা নিজের মনোভাব গোপন করিয়া ভোটারদেরে ফাঁকি দিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করা যায় তাদের সমষ্টিকে এক-একটি বাক্য বলা হয়। যথা: বাকী+ও এই দুইটি শব্দের সমষ্টিই বাক্য। কখনও পূরণ না করিবার মতলবে যে সব ওয়াদা বা আওয়াজ করিয়া বাকী মূল্যে ভোট খরিদ করা হয়, তাকেই বাক্য বলা হয়।

পদ— ঐ সব বাক্যের বিভিন্ন অংশ বা শেয়ারকে পদ বলে। যথা: প্রেসিডেন্ট, স্পিকার, মিনিস্টার, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি, এম্বেসেডর ইত্যাদি।

৩। বাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহ যে সব ধনী (ধ্বনি নয়) দ্বারা ব্যক্ত হয়, তার প্রত্যেকটিকে বর্ণ (রং) বা হরফ (পাড়) বলা হয়। যথা: (সাবেক) নাইট, নবাব, সার, খানবাহাদুর এবং (হালের) নিশান, হিলাল, সিতারা ও তমগা।

৪। বর্ণ দুই প্রকার: সর ও ব্যঞ্জন।

সর— দুধের মধ্যে সর শ্রেষ্ঠ দুধের উপরে ভাসে বলিয়া। বর্ণের মধ্যেও যারা উপরে ভাসে তাদেরেই সরবর্ণ বলা হয়। যথা: (সাবেক) নাইট-নবাব; (হালের) নিশান, হিলাল।

ব্যঞ্জন— খাদ্যের মধ্যে ব্যঞ্জন-ভর্তা শাক-সুটকি ও পান্তাভাত যেমন নিকৃষ্ট, বর্ণের মধ্যেও তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণ নিকৃষ্ট। লবণ-মরিচ না মিশাইলে যেমন ব্যঞ্জন মুখে দেওয়ার অযোগ্য, বর্ণের মধ্যেও ব্যঞ্জনেরা একাএক রাজ-দরবারে প্রবেশ করিতে পারে না। যথা—খান সাহেব, সিতারা ও তমগা।

প্রকাশ থাকে যে বর্ণ বা হরফ সম্বন্ধে এখানে বাংলা মতের উল্লেখ করা হইল। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র বিধায় এখানে আরবী মতও

জানা থাকা দরকার। আরবী ব্যাকরণ মতে সরবর্ণের চেয়ে ব্যঞ্জনবর্ণ শ্রেষ্ঠ। সরবর্ণকে সেখানে হরফে ইল্লত বা অসুখের রং বলা হয়। যথা, জণ্ডিস, কালাজ্বর, এনিমিয়া। ব্যঞ্জনবর্ণকে আরবীতে বলা হয় হরফে সহী বা বিশুদ্ধ রং। যথা, শ্বেত বর্ণ। তাই বলিয়া শ্বেতী বা ধলা কুষ্ঠ রোগ হইলে চলিবে না।

৫। সন্ধি। সন্ধি দুই প্রকার: সর-সন্ধি ও ব্যঞ্জন-সন্ধি।

সর-সন্ধি— সরে-সরে অর্থাৎ উপরের তলায়-উপরের তলায় সন্ধি হইলে তাকে সর-সন্ধি বলা হয়। যথা: প্রেসিডেন্ট, মিনিস্টার বা হাই-অফিশিয়ালদের সাথে শিল্প-পতি বা সওদাগরদের সন্ধি হইলে তাকে বলা হয় সর-সন্ধি। যথা: চেম্বার-অব-কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন-সন্ধি— ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে বা সরে-ব্যঞ্জনে সন্ধি হইলে অর্থাৎ কিনা শ্রমিকে-শ্রমিকে অথবা শ্রমিকে-মালিকে সন্ধি হইলে তাকে বলা হয় ব্যঞ্জন-সন্ধি। যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি।

৬। পদ প্রকরণ।

যে নিয়মের দ্বারা পদের প্রকার ভেদ করা হয়, তাকে পদ-প্রকরণ বলা হয়। আরবীতে একে বলা হয় নহু বা পথ। অর্থাৎ যে পথে মহাজনগণ গিয়াছেন সেই পথ। ইংরাজীতে একে বলা হয় সিন্‌ট্যাক্স অর্থাৎ ট্যাক্স সহ। মহাজনের পথে চলিবার ও ট্যাক্স বহন করিবার ক্ষমতা বিচারের যে নিয়ম তাহাই পদ-প্রকরণ। এই-পদ-প্রকরণে পদকে ভাষা ব্যাকরণের মতই রাজনৈতিক ব্যাকরণেও পাঁচ প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে; যথা, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া পদ ও অব্যয়। তবে স্বভাবতই তাদের ফাংশনে পার্থক্য আছে। যথা:

বিশেষ্য— যে পদ দ্বারা শুধু বিশেষ ব্যক্তি বুঝায়, কাজ বুঝায় না, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যথা প্রিসাইড করেন না তবু প্রেসিডেন্ট, স্পিক করেন না তবু স্পিকার; মন্ত্রণা দেন না তবু মন্ত্রী।

বিশেষণ— যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বুঝায় তাকে বিশেষণ বলে। ফিল্ড মার্শাল, লাইফ প্রেসিডেন্ট, অনারেবল মিনিস্টার, অনারারি ম্যাজিস্টেট ইত্যাদি।

সর্বনাম— যে পদ অন্য যে কোনও পদের স্থলে বসিতে পারে, যে নাম সকল নামের বদলে চলিতে পারে, তাকে বলে সর্বনাম। এই হিসাবে যে রাজনীতিককে সর্বদলীয় বলা যায় তিনিই সর্বনাম। যে কোনও পার্টি'ই মন্ত্রিসভা গঠন করুক, এমন সর্বনাম ব্যক্তির মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কোনও অসুবিধা নাই। যথা: পাকিস্তানের মন্ত্রীদের মধ্যে আলেম, হাফেয ও ডাক্তার প্রভৃতি।

ক্রিয়াপদ— যে পদের দ্বারা ক্রিয়া বা কাজ বুঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যথা, দারওয়ান, মোটর ড্রাইভার, ডিডরাইটার, টিকেট-চেকার ইত্যাদি।

অব্যয়— যে পদে কোনও ব্যয় হয় না, শুধু আয় হয়, তাকে অব্যয় বলা হয়। যে সব পদে বেতনের উপরি ড্রাইভার সহ গাড়ি, ফ্রিফার্নিস্ড বাড়ি, সরকারী খরচে চিকিৎসা, ধুপা-নাপিত ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে, সেখানে বেতনের টাকা ব্যয় করিবার কোনও রাস্তা নাই বলিয়া ঐ সব পদকে অব্যয় পদ বলা হয়।

৭। লিঙ্গ।

শব্দটা অশ্লীল বলিয়া শালীন রাজনীতিতে উহার স্থান নাই। তাছাড়া এটা গণতন্ত্রের যুগ। এ যুগে 'পুরুষ-নারীতে কোনও ভেদাভেদ নাই' এই কথা বলিয়া নারী জাতিকে ঠকানই রাজনীতির বড় উদ্দেশ্য। লিঙ্গ ভেদ করিলে সংখ্যানুপাতে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করিতে হয়। পুরুষের চেয়ে দুনিয়ায় নারীর সংখ্যা বেশী। এই যুক্তিতে পুরুষরা একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু সংখ্যানুপাতে নারীকে আসন দিতেছে না। ভবিষ্যতে সাফ্রাজেট আন্দোলনের ফলে রাজনীতিতে

নারী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তখনও লিঙ্গভেদ থাকিবে না অর্থাৎ পুরুষের জন্য একটি আসনও সংরক্ষিত থাকিবে না। সব আসনই নারী দখল করিবে। এই জন্যই রাজনীতিতে লিঙ্গভেদের কোনও প্রয়োজন নাই।

৮। বচন।

ভাষার ব্যাকরণে বচন তিনটি: যথা এক বচন, দ্বি-বচন, বহু বচন। কিন্তু রাজনীতিক ব্যাকরণে বচন মাত্র একটি: যথা বহু বচন। বহু বচন মানে অনেক কথা। কথক আমি। শ্রোতা জনতা। জনতার বহু রূপ। কাজেই আমাকেও বহু বচনী বহু রূপী হইতে হয়। যথা: মেহনতী জনতা, শোষিত জনগণ, মূক জনসাধারণ মূর্খ পাবলিক, উচ্ছৃঙ্খল মব ইত্যাদি ইত্যাদি।

৯। পুরুষ।

ভাষার ব্যাকরণের মতই রাজনৈতিক ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম ও অধম। বস্তুতঃ ভাষার ব্যাকরণের এই অধ্যায়টিই রাজনৈতিক ব্যাকরণে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত, গৃহীত ও প্রতিফলিত।

উত্তম পুরুষ— আমি ও আমরা অর্থাৎ আমার পরিবারের লোক ও আত্মীয়স্বজন।

মধ্যম পুরুষ— তুমি ও তোমরা অর্থাৎ তোমরা যারা আমার দলে আছ।

অধম পুরুষ— সে বা তাহারা। যারা আমার বা তোমার সাথে নাই তারা। ইংরাজীতে ঠিকই বলা হইয়াছে: যারা আমাদের সাথে নাই, তারা আমাদের বিরুদ্ধে। তারাই সংহতি-ভঙ্গকারী। অর্থাৎ তারা অধম।

ব্যাকরণের এই অধ্যায়টুকু ধর্ম ও দর্শন-শাস্ত্রের অনুমোদিত। ধর্ম-শাস্ত্র বলে: আনাল হক, অহং ব্রহ্ম। দর্শন-শাস্ত্র বলে কজিটো আগুসাম। আমি আছি, তাই তুমিও আছ। অতএব আমি উত্তম, তুমি মধ্যম। ব্যস আর কেউ না। আমি খাইয়া যা থাকিবে তা তুমি পাইবে।

১০। কারক।

ভাষার ব্যাকরণে কারক ছয় প্রকার। কিন্তু রাজনীতির ব্যাকরণে কারক মাত্র দুই প্রকার: যথা: যে নিজ হাতে কাজ করে। আর যে হুকুম দিয়া পরের হাতে কাজ করায়। ক্রিয়া বা কাজের সহিত যার অন্বয় (সম্বন্ধ), ব্যাকরণের ভাষার তাকেই বলা হয় কারক। এই সম্বন্ধ বিচার হয় কাজের গুণাগুণ দিয়া। ক্রিয়া যদি ভাল হয়, লাভের হয়, প্রশংসার হয়, তবে সে ক্রিয়ার কারক আমি। কিন্তু সে ক্রিয়া যদি মন্দ হয়, লোকসানের হয়, নিন্দার যোগ্য হয়, তবে তার কারক তুমি।

১১। বিভক্তি।

ভাষার ব্যাকরণে বিভক্তি সাত প্রকার। কিন্তু রাজনীতিক ব্যাকরণে বিভক্তি মাত্র দুইটি। যথা আমার ভাগ ও তোমার ভাগ। আমারটা বড়, তোমারটা ছোট।

১২। কাল।

ভাষার ব্যাকরণে কাল তিনটি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু রাজনীতিতে কাল মাত্র একটি। যথা, বর্তমান। আমি অতীতে কি ছিলাম, কার সাহায্যে বর্তমান পদোন্নতি লাভ করিয়াছি, সে সব কথা ভুলিতে হইবে। কি করিলে ভবিষ্যতে আমার শাস্তি হইতে পারে, তাও মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। শুধু বর্তমানে 'যত পার খাও লুটপুটি নাও দুহাতে, কারও মানা তুমি শুনিও না কভু উহাতে।'

১লা জুন, ১৯৫৮

অথ কুত্তা শিয়াল চরিতামৃত

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সুন্দরবন, বাঘের বাসা।

কাল—আদি অনন্ত মহা সন্ধ্যা।

অস্তি মধুমতী-তীরে বিশাল গর্জন-তরুরাজি নামধর্সস্য সুন্দরবনং। স্বনামধন্য পশুরাজ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সাম্রাজ্যই সুন্দরবন। বৃটিশ সিংহের সাম্রাজ্যে যেমন সূর্য্য অস্ত যায় না; বেঙ্গল টাইগারের এই সাম্রাজ্যে তেমনি সূর্য্য উদয় হয় না। এই ঘন তমসাবৃত বন যেমন অন্ধকার তেমনি সুন্দর। এই ঘন-ঘোর ছিদ্রহীন তমসাচ্ছন্ন অরণ্যের অধিবাসীরা বনের বাহিরে না গিয়া কোনও দিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না। কিন্তু এ বনের সব জীব-জন্তু ও পোক-পাখালির চোখে এই জমাট-বাঁধা অন্ধকার শুধু সহিয়া যায় নাই; ইহা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রং বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সবল থাবার সুশাসনে মাছে-বিড়ালে এক ঘাটে পানি খাইয়া পরম সুখ-শান্তি ও আনন্দ-আহলাদে রাত যাপন করিতেছে।

রাজ-দরবার। রয়েল বেঙ্গল টাইগার একটা গাছের মুথার উপরে সিংহাসনে উপবিষ্ট। পারিষদবর্গ শ্রেণীমত কাতার করিয়া দণ্ডায়মান। রাজার মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর। পারিষদবর্গ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত।

রাজা জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন: শ্রবণ কর হে আমার উযির-নাযির-অমাত্যবর্গ ও বাধ্য-অনুগত প্রজাগণ, আমার এই সুখ-শান্তি-পূর্ণ সাম্রাজ্যের মধ্যে কতিপয় দুষ্ট লোক এই সর্বপ্রথম রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমার গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে অবগত হইয়াছি। তাই আমি আজ এই যরুরী রাজ-দরবার আহবান

১০—

করিয়াছি - তোমরা কে কি জান এ ব্যাপারে আমার নিকট সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ কর। আমি এই ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই নির্মূল করিতে চাই। আমার প্রিয় ভাগিনা ও বিশ্বস্ত উযির শিবাচরণ পণ্ডিত কি বলে, সে কথাই আমি আগে জানিতে চাই। তার পরে আমার প্রধান সেনাপতি কুতুব খাঁর কথা শ্রবণ করিব।

শিয়াল ও কুত্তার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল। চোখ ইশারায় অনেক কথা হইয়া গেল।

শিবা।—হে পূজ্যপাদ মাতুলদেব, আপনি দয়া করিয়া আমাকে ভাগিনা বলিয়া স্বীকার করেন, সে জন্য আমি গর্বিত। কিন্তু উযির বলিয়া আমারে ঠাট্টা করেন কেন? সকল রাজ-কার্যে আপনি ত আমার বদলে আমার চাচাত ভাই খেঁকশিয়ালের বুদ্ধি-পরামর্শই লইয়া থাকেন? আজিকার পরামর্শও তারই কাছে জিজ্ঞাসা করুন না কেন?

রয়েল বেঙ্গল।—হে মুর্খ ভাগিনা, আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমার বদলে তোমার চাচাত ভাই খেঁকশিয়ালের পরামর্শ নিয়া থাকি। সে স্পষ্টতঃই তোমার চেয়ে অনেক চালাক ও বুদ্ধিমান। কাজেই মন্ত্রণা নেই আমি তার কাছে, কিন্তু মন্ত্রী কই আমি তোমারেই। এতে লাভ ত তোমারই। এটা তুমি বুঝিতে পার না?

শিবা।—নিশ্চয় বুঝিতে পারি হে আমার মহিমান্বিত মামুজী। বুঝি বলিয়াই ত আজকার উপদেশটাও আমার চাচাত ভাইকেই দিতে বলিতেছি।

রয়েল।—রাগ অভিমান করিও না হে আমার প্রাণতুল্য ভাগিনা। খেঁকশিয়াল আমার ভাগিনেয় না হইলেও ভগিনী-পতির মানে তোমার বাবার ভাতিজা। সেই হিসাবেই আমি তাকে ভাগিনার মর্য্যাদা দিয়া থাকি। কিন্তু মন্ত্রীর পদমর্য্যাদা তাকে দেই না। সেটা দিয়া থাকি তোমাকেই। খেঁকশিয়াল আমাকে যে মন্ত্রণা দিয়া থাকে, সেটা ত তোমার পক্ষ হইতেই দেয়।

শিবা।—সে কথা সত্য মামুজী। হে আমার ফার্স্ট কাযিন খেঁকশিয়াল ভাই, মামুজীর কথার উত্তর দাও।

খেঁক।—হে মহামান্য মাতুল মহারাজ, আমার বিবেচনায় সত্যই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমার সুস্পষ্ট রায় এই যে ষড়যন্ত্র-কারীদের ফাঁসি হওয়া উচিত। ষড়যন্ত্রকারীরা অবশ্য বলিতেছে তারা নিজেদের দেশ নিজেরা শাসন করিতে চায়, তারা আপনার বা কারোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে না। কিন্তু আপনি এদের ওকথায় কান দিবেন না। মনও নরম করিবেন না;

রয়েল বেঙ্গল।—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আমি তাদের কথায় প্রতারিত হইব না। মনও আমার নরম হইবার নয়। কিন্তু হে আমার সতাল ভাগিনা, বলিতে পার তারা নিজেরা এই দেশ শাসন করিতে চায় কেন? পারিবে তারা এই দেশ শাসন করিতে?

খেঁক।—ওয়াক থু। তারা পারিবে দেশ শাসন করিতে? দেশ শাসন তারা করিয়াছে কোনও দিন বাপ-দাদার কালে? তারা বলে তারা গণতন্ত্র অর্থাৎ মেজরিটি শাসন চায়। চাহিলেই হইল? মেজরিটিতে দেশ শাসন করিয়াছে কোনদিন? দেশ শাসন করা রাজা-বাদশার কাজ। রাজ-বংশে জন্ম না হইলে কেউ দেশ শাসন করিতে পারে? আপনি হইলেন আদত শরিফ খান্দানের রাজ-বংশ। আপনের সামনে এক শ ঘোড়া গাধা-শিয়াল-কুত্তা লাগে না। সংখ্যায় বেশী হইলেই হইল? ছি ছি এটা একটা কথা হইল?

শিয়াল-কুত্তার প্রতি এই বক্রোক্তি করিতে পারিয়া খেঁকশিয়াল খুশী হইল। আড়চোখে ওদের দিকে চাহিল। ওরাও কটমটাইয়া চাহিল। রয়েল বেঙ্গল খেঁকশিয়ালের বক্তৃতায় খুশী হইয়াছিলেন। তিনি কুত্তা-শিয়াল ও খেঁকশিয়ালের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ের দিকে নযর দিবার অবসর পাইলেন না। নিজের কথা বলিয়া চলিলেন।

রয়েল বেঙ্গল।—শুধু শরিফ খান্দানের কথা বল কেন? বাঘের মধ্যেও আমরা খাস সৈয়দ বংশ। পশ্বধম মানুষেরা পশ্চিমে আরব

দেশ হইতে আসিলেই দাবি করে তারা সৈয়দ বংশ। আমার পর দাদারা আসিয়াছেন আরবেরও অনেক পশ্চিমের আন্দাল‍ুস হইতে। এই আন্দাল‍ুসই সভ্যতার আদি পীঠস্থান।

অমাত্যবর্গ সকলে (বিস্ময়ে)।—আন্দাল‍ুস কোথায় জাহাঁপানা?

রয়েল বেঙ্গল।—আরে মূর্খের দল, আন্দাল‍ুস কোথায় তাও জান না? এই জ্ঞান লইয়া তোমরা স্বরাজ-স্বাধীনতার কথা চিন্তা কর? তোমরা সকলে নও অবশ্যই। তোমাদের মধ্যে কতিপয় অতি মূর্খ আর কি? শোন তবে মূঢ়ের দল। আজকাল যে দেশকে স্পেন বলা হয়, আমার পরদাদার আমলে তাকেই আন্দাল‍ুস বলা হইত।

সকলে।—কি তাজ্জবের কথা! জাহাঁপানা আপনের পরদাদারা তবে কি স্পেন মুল্ল‍ুক হইতে আসিয়াছিলেন?

রয়েল।—তবে আর বলিতেছি কি? আমার পূর্ব-পুরুষরাই দুনিয়ার আদি শাসক। সকলে তাদেরে শুধু মানিত না। পূজা-উপাস নাও করিত।

সকলে।—পূজা-উপাসনা করিত? তবে কি তারা দেবতা ছিলেন?

রয়েল বেঙ্গল।—আলবত দেবতা-ভগবান ছিলেন। স্পেনীয় ভাষায়, ভগবানকে বলা হইত বিসন। ঐ দেশের সকলেই বিসনের পূজা করিত। ঐ দেশের আল্-তামিরা, লাসক্স ইত্যাদি প্রাচীন গুহায় আজও আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অমর কীর্তি রহিয়াছে।

সকলে।—বলেন কি বাদশাহ্ নামদার? তবে সে পূর্ব-পুরুষের গৌরবের দেশ ছাড়িয়া এই বাংলা মুল্ল‍ুকে সুন্দরবনে আসিলেন কেন হুযুর?

রয়েল বেঙ্গল।—সে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? কালক্রমেই সেই সভ্য দেশে প্রাদুর্ভাব ঘটিল পঙ্গপালের মত একদল বানরের। ঐ বানরের উৎপাতে আমার পরদাদারা দেশ ছাড়িয়া পূর্ব দিকে যাত্রা করেন এবং অবশেষে এই দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

সকলে।—কি বলিলেন জাহাঁপানা? আপনারা শার্দ‍ুলের জাত। বানরের ভয়ে আপনারা দেশ ত্যাগ করিলেন?

রয়েল বেঙ্গল।—ভয়ে নয় হে মূর্খের দল, বিরক্তিতে। লক্ষ কোটি রোগ-জীবাণুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অত শক্তিশালী পশ্বধম মানুষও যেমন বাসস্থান পরিবর্তন করে, আমার পূর্ব-পুরুষরাও তাই করিয়াছিলেন।

সকলে।—তা বটে। তারপর?

রয়েল বেঙ্গল।—তারপর আমার পূর্ব-পুরুষরা এই দেশে আসিয়া দেখেন, দুই পা-বিশিষ্ট পশ্বধম মানুষেরা এই দেশ দখল করিয়া আছে। আমার পরদাদারা সেই পশ্বধমদের কতক খাইয়া আর কতককে তাড়াইয়া এই দেশের আযাদি হাসিল করেন। তারপর আল্লাহ্‌সে আমাদের প্রিয় পুরাতন বাসস্থান সুন্দরদরের স্মৃতি রক্ষাকল্পে এই দেশের নামকরণ করেন সুন্দরবন। সেই হইতে আমাদের খান্দানের সুশাসনে তোমরা সেই দুই পা-বিশিষ্ট জানওয়ারাধমদের অত্যাচার-মুক্ত হইয়া পরম সুখ-শান্তিতে দিন যাপন করিতেছ। অথচ আজ তোমাদের মধ্য হইতে কতিপয় বদমায়েশ গণতন্ত্রের ধুয়া তুলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই দেশদ্রোহীদের খপ্পর হইতে দেশকে বাঁচাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে তোমাদের নিজেদেরই। তোমরা সব প্রস্তুত ত?

অমাত্যবর্গ।—আলবত আমরা প্রস্তুত। আপনার বাদশাহির জন্য আমরা জান কোরবান করিতে দ্বিধা করিব না। আপনি আদেশ করুন জাহাঁপানা। আমাদের জনপ্রিয় বাদশা রয়েল বেঙ্গল যিন্দাবাদ। দেশ-দ্রোহী মুর্দাবাদ।

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সভার কাজ শেষ হইল। সারা সুন্দরবনে সাজসাজ রব উঠিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সুন্দরবনের পূর্বকোণে কুত্তার আস্তানা।
সময়—পর দিবস দুপুর বেলা।

কুত্তা ও শিয়ালের মহা সম্মিলনী। সভায় একদিকে বাঘা কুত্তা, ডাল কুত্তা, ষাড় কুত্তা, খেরি কুত্তা, খেকি কুত্তা, নেড়ি কুত্তা, নেউলিয়া কুত্তা, আলসিয়া (এলসিশিয়ান) কুত্তা ইত্যাদি উনিশ সম্প্রদায়ের সারমেয় জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি, অপরদিকে শিবা, ঘোগ, খেঁকশিয়াল ভৃঙ্গি, খাটাশ, ওয়াপ, লঙ্গর, ইত্যদি একাদশ শ্রেণীর শিয়াল নেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ উপবিষ্ট। সকলের মুখেই দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তারা আজ শেষ বারের মত একতাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়। শিবা ও সারমেয় এই দুই সম্প্রদায়ের বহু যুগব্যাপী বিরোধ-কলহ ভুলিয়া আজ জাতীর মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অটল পন করিয়া আজ তারা এই মহাসম্মিলনীতে সমবেত হইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মুখে তাই আসন্ন বিজয়ের আশা-উদ্দীপনা সুপরিস্ফুট। সমবেত জনতা মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি করিতেছে। 'কুত্তা-শিয়াল ভাই-ভাই,' 'সুন্দরবনের মুক্তি চাই,' 'বাঘের যুলুম চলবে না,' 'রাজার শাসন মানব না' ইত্যাদি ইত্যাদি স্লোগানে সুন্দরবনের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত।

বাঘা কুত্তা সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। আসন মানে নিজের কুণ্ডলী-পাকানো লেজ। সেই লেজের উপর ভর করিয়া গলা উচা করিয়া জঙ্গল কাঁপাইয়া আসমান ফাটাইয়া সভাপতি দুইটা আওয়াজ করিলেন: ঘেউ ঘেউ। উহার ইংরাজি পার্লামেন্টারি অর্থ: অর্ডার অর্ডার।

সভা নিস্তব্ধ হইল। সভাপতি তাঁর স্বভাবসুলভ জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন: সমবেত শিয়াল-কুত্তা ভাইগণ, আজিকার এই মহতী জাতীয় সম্মিলনীতে আমাকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া আমার যে মর্য্যাদা দিয়াছেন সেজন্য আপনাদিগকে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তারপর সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে এই সম্মিলনীতে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। আমরা আজ যে পবিত্র মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছি, সেই উদ্দেশ্য বর্ণনা করিবার জন্য আমি প্রথমেই আমাদের পরম পূজনীয় শিবা সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদিত নেতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবু পণ্ডিত মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানাই-তেছি। তিনি তাঁর সুললিত কণ্ঠে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় আমাদের আজিকার মহান উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

শিবু পণ্ডিত মহাশয় দণ্ডায়মান হইলেন। সমগ্র সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি হইল। কুত্তারা ঘেউ-ঘেউ ও শিয়ালেরা উক্কেহুয়া ধ্বনি করিল। সে হর্ষধ্বনি থামিবার পরও অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাতপিটার সমবেত ধড়াস-ধড়াস ও নৌকার বৈঠার ধুপ-ধাপ আওয়াষ তবকা-ধ্বনির মত মধুর বোলে সভাপতি সহ সকল সভ্যমণ্ডলীর দেহে অপূর্ব তালের রোমাঞ্চ তুলিল। সকলে বুঝিল, কুত্তারা দেখিল, শিয়ালগণ তাদের লেজের দ্বারা তালে-তালে মাটিতে বাড়ি মারিয়া মারিয়া এই তবলা ধ্বনি করিল।

কণ্ঠের গান ও লেজের তবল-চাটি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এবং শিবু পণ্ডিত মুখ খুলিবার আগে খেঁকশিয়াল দাঁড়াইয়া বলিল, মিঃ প্রেসিডেণ্ট, অন-এ-পয়েণ্ট-অব-অর্ডার সার।

সভাপতির ইশারায় পণ্ডিতজী বসিয়া পড়িলেন। তখন সভাপতি খেঁকশিয়ালকে বলিলেন: কি আপনের পয়েণ্ট অব-অর্ডার?

খেঁক: এই সম্মিলনীতে ঘোগ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন দেখিতেছি। সকলেই জানেন, ঘোগেরা প্রায়শঃ বাঘের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এতে আমাদের সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে বাঘের সাথে ঘোগের কোনও আঁতাত নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এ অবস্থায় ঘোগের উপস্থিতিতে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মিলনীর কাজ চলিতে পারে না।

খেঁকশিয়াল আসন গ্রহণ করিল। সভাপতি ঘোগের নেতার দিকে চাহিয়া বলিলেন: এই পয়েণ্ট-অব-অর্ডার ভ্যালিড বলিয়া আমি রায় দিলাম। আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন।

ঘোগ-নেতা।—(মিষ্টি হাসিতে সভাস্থল মাতাইয়া) মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমরা মাঝে-মাঝে বাঘের বাসা বাঁধি বটে, কিন্তু তা করি আমরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে গুপ্তচর-বৃত্তির জন্য শত্রু-গৃহ ফিফথ কলামের কাজ করিতে। সেজন্য এই সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আমার সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তা না করিয়া আমাদের উপস্থিতিতে অবজেকশন দেওয়া হইয়াছে। অকৃতজ্ঞতারও একটা সীমা আছে। আর আপত্তি উত্থাপন করিতেছে কিনা বাঘের ভাগিনা খেঁকশিয়াল। মামার পক্ষে তারাই এ সম্মিলনীতে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছে কি না, তারই পরীক্ষা আগে হইয়া যাক। আমিও এ বিষয়ে কাউন্টার পয়েন্ট-অব-অর্ডার রেইয করিলাম মিঃ প্রেসিডেন্ট। আপনার রুলিং চাই।

সভাপতি রুলিং দিবার আগেই ঘোগ ও খেঁক উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও হৈ-হল্লা বাধিয়া গেল। গালাগালি হইতে হাতাহাতির উপক্রম।

সভাপতি কর্ণ-ভেদী মাটি-ফাটা আওয়ায করিলেন: ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ। অর্ডার, অর্ডার, অর্ডার প্লিয।

সভা আস্তে-আস্তে শান্ত হইল। সভাপতি বলিলেন: বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের কথা। জাতির ঐ সঙ্কট মুহূর্তে আপনাদের কেউ-কেউ ঐক্য ঈমান ও শৃঙ্খলা-বিরোধী কাজ করিতেছেন। এত বড় প্রবল শত্রুর সাথে আমরা তবে কি লইয়া সংগ্রাম করিব?

বিবাদকারী পক্ষদ্বয় লজ্জায় অধোবদন হইল। সভায় সুঁই-পড়া নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

সভাপতি ও তাঁর অনুকরণে অনেক বক্তাই ঐক্য ঈমান ও শৃঙ্খলার আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ঘোগ ও খেঁক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে পরস্পরের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রত্যাহার করিবার অনুরোধ করিলেন।

আপত্তি প্রত্যাহৃত হইল। পয়েন্ট-অব-অর্ডার উইথড্র হইল। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে গলাগলি কোলাকুলি হইল। ঐক্য ও সংহতি

আগের চেয়ে মজবুত হইল। সভার পরিবেশ ও আবহাওয়া প্রীতিপূর্ণ হইল।

সম্মিলনীর কাজ জাবেদাভাবে শুরু হইল। প্রথমে সভাপতি তাঁর সারগভ অভিভাষণ দিলেন। তাতে তিনি ব্যাঘ্র জাতির অন্যায়ভাবে এই দেশ দখল ও চরম অত্যাচার-যুলুমের দ্বারা প্রজা-সাধারণে জীবন অসহনীয় করিয়া তুলার আদি-অন্ত সমস্ত ইতিহাস ও স্বরাজ-স্বাধীনতা আন্দোলনের সাধু উদ্দেশ্যের কথা যুক্তি-তর্ক ও দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে তিনি ইতিহাসে এই গোপন তত্ত্ব ও গূঢ় তথ্যও প্রকাশ করিয়া দিলেন যে ব্যাঘ্র জাতি তাদের বিদেশীত্ব গোপন করিবার অসাধু ও তঞ্চকতাপূর্ণ উদ্দেশ্যে বেঙ্গল টাইগার নাম গ্রহণ করিয়াছেন। নিজেদের বাদশার জাতি প্রমাণ করিবার মতলবে রয়েল উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ উপাধি ও নাম যে ইতিহাসের বিচারে অসার, অসত্য ও ভিত্তিহীন বহু গবেষণা-পূর্ণ তথ্য ও প্রাচীন দলিল-দস্তাবেয দিয়া তিনি তা প্রমাণ করেন।

সমবেত বিশাল জনসমুদ্র গলার জোরে ও লেজের বাড়িতে হর্ষধ্বনি ও তবল-চাটিতে সভাপতির উক্তি সমর্থন করিল।

সভাপতি ভাষণের পর আরও বহু নেতা অনুরূপভাবে ও ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। সকলেই অচিরে বাঘের যুলুমের রাজত্ব অবসান করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনও ত্যাগ স্বীকারে নিজেদের অটল সংকল্প ঘোষণা করিলেন।

সমবেত ডেলিগেটগণ কঠোর ঘেউ-ঘেউ ও লেজের তবল-চাটিতে হর্ষধ্বনি করিয়া বক্তৃতাসমূহের সমর্থন করিল।

সম্মিলনীতে সর্ব-সম্মতিক্রমে বহু প্রস্তাব গৃহীত হইল। অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দাবি করিয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না করিলে সার্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া এবং এই সমস্ত দাবি-দাওয়া রাজার নিকট পেশ করিবার জন্য শক্তিশালী প্রতিনিধি

দল গঠন করিয়া, সর্বশেষে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম-পরিষদ গঠন প্রস্তাবাদি মুহূর্মুহু হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হইল।

উপসংহারে সভাপতি সাহেব জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব গণ-ঐক্যের জন্য জনসাধারণকে ও তাদের নেতৃবৃন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া এবং রাজতন্ত্রের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই গণ-ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া সম্মিলনীর সমাপ্তি ঘোষণা করিলেন। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যিন্দাবাদ-ধ্বনির মধ্যে সম্মিলনী সমাপ্ত হইল।

সম্মিলনী সমাপ্ত হইল বটে কিন্তু তার রেশ রহিল সুন্দরবনের আকাশে-বাতাসে। রাজতন্ত্রের অবসানের আর বিলম্ব নাই, পর্যবেক্ষক-মহলের নিকট তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সুন্দরবন-রাজের গোপন মন্ত্রণা-কক্ষ।
কাল—গভীর রাত্র।

বন-রাজ রয়েল বেঙ্গল টাইগার সিংহাসনে উপবিষ্ট। বিশেষভাবে মনোনীত বিশ্বস্ত পারিষদবর্গ রাজার ডাইনে-বামে দণ্ডায়মান। মন্ত্রণা-কক্ষের দরজা অবরুদ্ধ। বাহিরে সতর্ক প্রহরী। রাজাবাহাদুরের বিশেষ উপদেষ্টা বোর্ডের যরুরী বৈঠক। রাজা সহ সকলের মুখ বিষণ্ণ, গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

রাজা।—(মন্ত্রণা-কক্ষের বন্ধ দরজা-জানালার দিকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া) হে আমার বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গ, আজ আপনাদেরে আমি এই দুঃসংবাদ দিতে বাধ্য হইতেছি যে একদিকে আমার সিংহাসন টল-

টলায়মান; অপরদিকে আপনাদের সকলের জান-মাল আশু বিপদগ্রস্ত। গত বৈঠকে আমি যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম, অভাবনীয় দ্রুত-গতিতে সে বিপদ দেখা দিয়াছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যে দুইটি সম্প্রদায় সবচেয়ে সংখ্যা-গুরু ও শক্তিশালী, যাদের আত্ম-কলহের সুযোগ লইয়া আমি এতকাল নির্বিবাদে রাজত্ব চালাইয়া আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছি, সেই কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায় তাহাদের পুরুষানুক্রমিক কলহ-বিবাদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং আমাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়াছে ও আন্দোলনের দিন-ক্ষণ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। গতকাল তাদের প্রতি-নিধিদল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলটিমেটাম দিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় আমার আপনাদের কর্তব্য কি, তা নির্ধারণ করিবার জন্যই এই যরুরী বিশেষ মন্ত্রণা-সভার বৈঠক আহবান করিয়াছি। বিপদ আসন্ন। এক মুহূর্ত বিলম্ব করিবার উপায় নাই। আজই এই মুহূর্তেই আমাদের কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

একে একে সব মন্ত্রীই বক্তৃতা করিলেন। কেউ চরম দণ্ডনীতি অব-লম্বনের পরামর্শ দিলেন। দেশে যুদ্ধ-পরিস্থিতির ইমার্জেন্সি ঘোষণা করিয়া দেখামাত্র গুলির আদেশ দিয়া সান্ধ্য আইন জারির পরামর্শ দিলেন। অপর পক্ষে কেহ-কেহ দেশে গ্র্যাজুয়েল রিয়েলিযেশন-অব-সেল্‌ফ্‌ গবর্নমেন্টের আশ্বাস দিয়া নেতৃবৃন্দের সাথে আপোষ করিবার পরামর্শ দিলেন। উভয় পক্ষই নিজ-নিজ প্রস্তাবের সমর্থনে জোরদার যুক্তি-তর্ক পেশ করিলেন।

কিন্তু কারও প্রস্তাব রাজার পসন্দ হইল না। তিনি নিজের অসন্তোষ গোপন করিতে পারিলেন না। মুহুর্মুহু হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। মন্ত্রীরা অধিকতর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন।

সভা নিস্তব্ধ। কেউ টু শব্দটি করিলেন না। শুধু মন্ত্রণা-কক্ষের এক কোণ হইতে একটি অস্পষ্ট কিচির-মিচির শব্দ আসিল। সকলের দৃষ্টি সেদিকে পড়িল। দেখা গেল, একটি বানর ঐ শব্দ করিতেছে।

এই গোপন বৈঠকে রাজা ও সমবেত মন্ত্রীদের ফুট-ফরমায়েশ করিবার জন্য রাজার আদেশে একটি বিশ্বস্ত বানরকে সভার এক কোণে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এই কিচির মিচির শব্দ তারই মুখ হইতে বাহির হইতেছিল। সকলের তীক্ষ্ণ ও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি বানরের উপর পড়ায় সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বলিল: মহারাজ, আমার গোস্তাখি মাফ করিবেন। আপনাদের আসন্ন বিপদের কথা শুনিয়া এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র পশ্বধম আর স্থির থাকিতে পারিল না। জীবনে জাহাঁপানার অনেক নুন খাইয়াছি। আজ সে নুনের সামান্য নিমকহালালি করিতে চাই।

বানরের কথায় সকলে বিস্মিত হইল। রাজা বাহাদুর সকলের বিস্ময়ের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন: তুমি করিবে নিমকহালালি কিরূপে?

বানর।—হুযূরের অভয় পাইলে আমি একটি নিবেদন করিতে চাই।

সমুদ্রে নিমজ্জমানের তৃণ-খণ্ড ধরিবার চেষ্টার মতই রাজা বলিলেন: অভয় দিলাম। বল, কি তোমার নিবেদন?

বানর।—হে মহারাজাধিরাজ, আপনি কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে পৃথক-পৃথক প্রতিনিধি দল হিসাবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।

রাজা।—উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি দল ত মাত্র গতকালই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে। আবার তাদেরে ডাকিয়া কি লাভ হইবে? তারা ত চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র।

বানর।—সেটা ছিল সম্মিলিত প্রতিনিধিদল। আপনি এবার ডাকিবেন তাদেরে পৃথক-পৃথক ভাবে। সেবার আসিয়াছিল তারা নিজেরা। এবার আসিবে তারা আপনার ডাকে। সেবার গিয়াছে তারা খালি মুখে ফিরিয়া। এবার আপনি তাদেরে চা-পার্টিতে দাওয়াত করিবেন।

রাজা।—(খানিক ভাবিয়া ও মন্ত্রীদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, স্বগত-ভাবে) তারা পৃথক-পৃথক ভাবে আসিতে রাযী হইবে কি?

বানর।—(মুচকি হাসিয়া) একবার নিমন্ত্রণ করিয়াই দেখুন মহারাজ।

রাজা।—বেশ না হয় তাদেরে চায়ের দাওয়াত করিলাম। কিন্তু তারা আসিলে কি বলিব তাদেরে?

বানর।—বেআদবি মাফ করিবেন জাহাঁপানা, আপনার কিছুই বলিতে হইবে না। যা বলিবার আমিই বলিব।

রাজা।—(ক্রুদ্ধ-স্বরে) মুখ সামলাইয়া কথা বল হে কিষ্কিন্ধাবাসী মর্কট-নন্দন। আমি স্বয়ং রাজা ও আমার মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকিতে আমাদের পক্ষে কথা বলিবে তুমি? এত বড় গোস্তাখি? আমি এই মুহূর্তে তোমার গর্দান লইব। কি বলেন মন্ত্রী মহোদয়গণ?

বানর।—(হাসিয়া) মন্ত্রী মহোদয়গণের আগেই আমি এই পশ্বধম নিবেদন করিতেছি, এই মুহূর্তে আমার গর্দান নিন জাহাঁপানা। কিন্তু তার আগে আপনাদের গর্দান রক্ষার পরামর্শটি আমার মুখ হইতে শ্রবণ করুন।

রাজা।—(খুশী হইয়া হাসি মুখে) তোমার সাহস দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। বল, তোমার পরামর্শটা কি?

বানর। ধর্মাবতার, আমার পোড়া মুখে নেতাদের সাথে কোনও কথা কওয়া যদি হুযুরের না-পসন্দ হয়, তবে আমি বলিব না। আপনার কানে-কানেই আমি সে কথা বলিব। আপনি নিজমুখে নেতাদের কাছে তা বলিবেন। এতে জাহাঁপানা খুশী ত? এইবার হুযুর নেতৃবৃন্দকে ডাকিয়া পাঠান। তাদেরে কি কি বলিতে হইবে হুযুরের কানে-কানে এখনই সে কথা বলিয়া দিতেছি।

বানরের যুক্তি রাজা ও তাঁর মন্ত্রিগণের পসন্দ হইল। ঠিক হইল পরদিনই কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে পৃথক-পৃথক চায়ের বৈঠকে নিমন্ত্রণ করা হইবে।

সভা শেষে রাজা ও বানরে অনেকক্ষণ কানাকানি হইল। রাজাকে খুব প্রফুল্ল দেখা গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান— সুন্দরবন বাঘের বাসা।
কাল—পরের পরদিন সকাল বেলা।

রাজবাড়ীতে চায়ের মজলিস। এ চা-পার্টি সারমের সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সম্মানে। রাজা, মন্ত্রিগণ ও সমাগত কুত্তানেতৃবৃন্দ চা বিস্কুট খাওয়ায় মশগুল। মজলিসে আনন্দের জোয়ার বহিতেছে। মনগোমারির ক্রিমক্রেকার ও ব্রুকবণ্ডের চা। ভাল না হইয়া যায়?

চা-বিস্কুট খাওয়া শেষ হইলে রাজা দাঁড়াইলেন। টার্কিশ টাওয়েল দিয়া মুখ মুছিতে-মুছিতে বলিলেন: হে আমার প্রজাকুল-তিলক সারমেয় সম্প্রদায়, তোমাদিগকে আমরা ব্যাঘ্র সম্প্রদায় নিজেদের কাযিন ব্রাদার মনে করি বলিয়াই চা-পার্টির অজুহাতে আজকার এই গোপন বৈঠক আহবান করিয়াছি। তোমাদের কাছে আমার অন্তরের ভেদ কথা যেমন বলিতে পারি, আর কারও কাছে তা পারি না। তোমাদের হাতে এই দেশ-শাসনের দায়িত্ব দিয়া আমি পবিত্র তীর্থস্থানে চলিয়া যাইব এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন সেখানেই সৃষ্টিকর্তার উপাসনায় কাটাইয়া দিব, এটা আমার বহুদিনের সঙ্কল্প। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাদের ত্রুটি থাকায় এবং ঐদিক হইতে শিবা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় আমার এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না। কারণ এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই যে আমি সিংহাসন ত্যাগ করা মাত্র ঐ শ্রেষ্ঠত্বের বলে দেশের রাজ্যভার শিবা সম্প্রদায় দখল করিয়া বসিবে। তোমাদের বদলে শিবা সম্প্রদায় রাজ্য শাসনের ভার নিলে অতি অল্প-দিনেই এ দেশ ধ্বংস হইবে। আমার পূর্ব পুরুষদের অতকালের কীর্তি লোপ পাইবে। সেজন্য আমার মনের গোপন অভিলাষ: তোমরা নীরবে অতি সংগোপনে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অনতিবিলম্বে ঐ ত্রুটি সংশোধন করিয়া ফেল। তোমাদের ঐ ত্রুটি সংশোধন হইলেই আমি তোমাদের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তীর্থযাত্রা করিব।

সারমেয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ গভীর মনোযোগে রাজার এই আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন শ্রবণ করিলেন। রাজার বক্তৃতা শেষ হইলে সারমেয় সম্প্রদায়ের সর্বজনমান্য প্রবীণ নেতা বাঘা কুত্তা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন : হে মহামান্য মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, আপনি আমাদের কোন্ ত্রুটির কথা বলিতেছেন ? আমরা বীরের জাতি। আমাদের মধ্যে এমন কোনও ত্রুটি নাই যার দরুন ভীত কাপুরুষ শিয়াল সম্প্রদায় আমাদের নিকট হইতে রাজ্যাধিকার কাড়িয়া নিতে পারে। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজা।—নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আমার মত সুখী আর কেউ হইত না। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। কারণ আমি জানি, এটা সত্য সত্যই গুরুতর ত্রুটি। এই ত্রুটির দরুন শিবা সম্প্রদায় অনায়াসে তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে। অথচ ত্রুটিটি এতই সামান্য যে অল্প দিনের সামান্য চেষ্টাতেই সে ত্রুটি সংশোধন হইতে পারে।

বাঘা কুত্তা।—হে আমাদের পরম হিতৈষী রাজা বাহাদুর, আপনি আদেশ করুন, আমাদের কোন্ সামান্য ত্রুটির দরুন শিবা সম্প্রদায় আমাদের হাত হইতে দেশের নেতৃত্ব কাড়িয়া নিতে পারে ? আমরা অবিলম্বে সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইব।

রাজা।—সাহসে, বীরত্বে, কণ্ঠস্বরে, ঐক্যে ও সংহতিতে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়াও মাত্র একটি ব্যাপারে তোমাদের দেহ ত্রুটিপূর্ণ। সেটা হইতেছে তোমাদের লেজের ত্রুটি।

কুত্তা।—আমাদের লেজের ত্রুটি কি মহারাজ ?

রাজা।—তোমাদের লেজ কুণ্ডলীকৃত বাঁকা।

কুত্তা।—তাতে কি হইল মহারাজ ? এই কুণ্ডলীকৃত বাঁকা লেজের জন্য ত আমরা কোনও অসুবিধা বোধ করি না।

রাজা।—এতদিন কর নাই। স্বাধীনতা লাভের পর সে অসুবিধা বোধ করিবে।

কুত্তা।—কি প্রকারে মহারাজ ?

রাজা।—এই ধর হর্ষধ্বনি ও আনন্দ প্রকাশের ব্যাপারটা পশ্বধম মানুষেরা যখন হর্ষধ্বনি ও আনন্দ প্রকাশ করে, তখন মুখে যেমন মারহাবা কয়, হাতেও তেমনি করতালি দেয়। ঠিক তেমনি শিবা সম্প্রদায় যখন আনন্দ প্রকাশ করে, তখন মুখে উক্কে হুয়া বলার সাথে-সাথে লেজ দিয়া সমবেতভাবে মাটিতে আঘাত করিতে থাকে। আমার রাজ-দরবারের মিশ্রিত সম্মিলনীসমূহের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের স্মরণ আছে। এই সেদিনকার রাজ-দরবারের কথাটাই ধর না কেন ? আমার বক্তৃতায় তোমরা সবাই হর্ষধ্বনি দিতেছিলে। কিন্তু তোমাদের গলার সুউচ্চ ও মধুর ঘেউ ঘেউ শব্দের সাথে-সাথে তবল-চাটির ন্যায় তালে-তালে ছাত পিটার ধড়াস-ধড়াস ও নৌকার বৈঠার ধুপ-ধাপ যে শব্দ সভা-মণ্ডপ আনন্দ-মুখর করিয়াছিল, তোমরা নিশ্চয় জান সেটা ছিল শিবা সম্প্রদায় ও তাদের মত লেজ-বিশিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায়ের লেজের আঘাত। কি মিষ্টি-মধুর রোমাঞ্চকর আওয়ায সেটা। তাতে বক্তারা যেমন মাতিয়া উঠে শ্রোতৃমণ্ডলীও তেমনি মাতোয়ারা ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এই হর্ষধ্বনির জোরে নেতারা জনতাকে উদ্দীপিত করিয়া নেতৃত্ব ও মন্ত্রিত্ব দখল করিয়া থাকে। আমার দৃঢ় আশঙ্কা, আমি রাজ্য ত্যাগ করিলে পশ্বধম মানুষের করতালির মতই শিয়ালেরা লেজ তালির জোরে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিবে এবং তোমাদের উপর এতদিনের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। তোমরা সে রিস্ক নিতে চাও নেওনা আমার কি ? আমি ত সপরিবারে তীর্থে চলিয়াই যাইব।

কুত্তা।—না মহারাজ, আপনি তা করিতে পারেন না। আপনি আমাদের হিতৈষী। আমাদের ঐ ত্রুটি সংশোধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, আমাদিগকে সে ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ দান করুন।

রাজা।—হে আমার অনুগত প্রিয় প্রজাগণ. তোমরা আজ হইতে নিজেদের লেজ সোজা করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ কর এবং যতদিন

লেজ সোজা না হয়, ততদিন স্বরাজ-স্বাধীনতা আন্দোলন হইতে নিজেরা দূরে থাক এবং শিয়ালেরা সে আন্দোলন করিতে চাহিলে তাতে বাধা প্রদান কর।

কুত্তা।—তা নিশ্চয় করিব। কিন্তু মহারাজ আদেশ করুন, কি উপায়ে আমরা বাঁকা লেজ সোজা করিব?

রাজা।—চর্বি মালিশ করিয়া।

কুত্তা।—কিসের চর্বি মহারাজ?

রাজা।—যে কোনও পশুর চর্বি হইলেই চলিবে। কিন্তু তাতে সময় লাগিবে।—শীঘ্র ফললাভ করিতে হইলে গাভিন শিয়ালনী ও সদ্য-বিয়ান বাচ্চা শিয়ালের চর্বি ব্যবহার করিতে হইবে।

কুত্তারা খুশী হইল। রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও স্বরাজ-আন্দোলন ঠেকাইয়া রাখার ওয়াদা করিয়া বিদায় হইল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সুন্দরবন বাঘের বাসা-গোপন মন্ত্রণা কক্ষ।
কাল—সেইদিন সন্ধ্যা বেলা।

সকাল বেলার মতই প্রহরী-বেষ্টিত দরবার হলে সান্ধ্য টি-পার্টি। চা-বিস্কুটের ব্যবস্থাও সকাল বেলার মতই। এ বেলার চা-পার্টি শিবা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সম্মানে।

চা-বিস্কুট খাওয়া শেষ হইলে রাজা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন: হে আমার প্রাণ-প্রিয় ভাগিনেয়গণ, তোমরাই আইনতঃ আমার এই সিংহাসনের ওয়ারিশ। তোমরা কেন ভিন্ন গোত্র ভিন্ন ধর্মের কুত্তা-সম্প্রদায়ের সাথে মিশিয়া তোমাদের মাতুলের সিংহাসনে তাদেরে শরিক করিতেছ, আমি তা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শিবু পণ্ডিত। মহারাজ, আপনি আমাদের পরম পূজনীয় মাতুল। বাপের সমতুল্য। কিন্তু বেআদবি মাফ করিবেন। আপনি আমাদের মুরুব্বি হইয়াও আমাদের ঐক্যজোটে ভাংগন ধরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনার এ চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আমরা ধর্ম-সাক্ষী করিয়া সারমেয় সম্প্রদায়ের সহিত প্যাক্ট করিয়াছি। আপনার এই ভেদনীতি, ডিভাইড এণ্ড রুল, আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাইতে পারিবে না।

শিবা প্রতিনিধিদল হিয়ার হিয়ার ধ্বনি উচ্চারিত হইল।

রাগে রাজার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। তার দাঁত বাহির হইল। কিন্তু অতি কষ্টে ক্রোধ গোপন করিয়া রাগের দাঁতকে হাসির দাঁতে পরিণত করিলেন। বলিলেন: হে আমার প্রাণপ্রিয় নির্বোধ ভাগিনেয় সম্প্রদায়, তোমাদের ঐক্য ভাঙ্গন ধরানো আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং তোমাদের ঐক্যকে বাস্তব সাম্যভিত্তিক করিয়া জোটকে অধিকতর মজবুত করাই আমার উদ্দেশ্য। অন্যথায় পরিণামে তোমরা প্রবঞ্চিত হইবে।

শিবা পণ্ডিত।—সেটা কিরূপ, হে আমাদের পরম পূজ্য মাতুল দেব?

রাজা।—সারমেয় সম্প্রদায়ের সহিত তোমাদের যে প্যাক্ট হইয়াছে, সেটা সাম্যের ভিত্তিতে হয় নাই, হইয়াছে দুই আন-ইকুয়াল পার্টনারের চুক্তি। আমি চাই, সে চুক্তি দুই সমান শক্তিশালী ইকুয়াল পার্টনারের প্যাক্ট হউক।

শিবা।—আপনার কথা এখনও বুঝিতে পারিলাম না হে আমাদের শ্রদ্ধেয় মামুজী।

রাজা।—বুঝিবে ভাগিনেয় বুঝিবে। ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক শ্রবণ কর। সারমেয় সম্প্রদায় একগুণে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি-চাতুর্য্যে তারা কোনদিন তোমাদের সমান নয়, সমান হইতে পারিবে না। কিন্তু ঐ একগুণে স্বাধীন দেশের নেতৃত্ব তারা তোমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নিবে।

শিবা।—সে কোন্ গুণ, মাতুল মহারাজ?

রাজা।—শুধু তাদের লেজের গুণে।

শিবা।—লেজের গুণে? কেমন করিয়া? তাদের লেজ ত বাঁকা।

রাজা।—বাঁকা বলিও না ভাগিনেয়। বল কুণ্ডলী পাকানো।

শিবা।—সে ত একই কথা হইল হে পূজনীয় মাতুল ঠাকুর।

রাজা।—না, এক কথা নয়, বাবাজী। কুণ্ডল আসলে সমস্ত জীবের মূলাধার-শক্তি। এই শক্তি-মূলাধার পদ্মে বিরাজ করে বলিয়া সাত্ত্বিক শাস্ত্রে কুণ্ডলীকেই আদ্যাশক্তি বলিয়াছে। ঐ শক্তি বলেই কুত্তারা অত নির্বোধ হইয়াও শক্তিতে এত প্রতাপশালী। আমার অবর্তমানে সেই শক্তি-বলেই কুত্তারা তোমাদের পরাজিত করিবে।

শিবা।—লেজের ঐ একটি গুণে তারা তা পারিবে?

রাজা।—একটি গুণ দেখিলে কোথায়? কতগুণের কথা বলিব? এই ধর, কুত্তার লেজ তাদের নিশান। ওটা তাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী। ঐ কুণ্ডলীকৃত লেজ উচাইয়া তারা নিজেদের জয় ঘোষণা করে। অবসর সময়ে সেই কুণ্ডলীকৃত লেজকে পিড়া বানাইয়া তাতে বসিয়া বিশ্রাম করে। বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে বলিয়াই তাদের গায়ে এত শক্তি। তোমরা লেজে বসিতে পার না বলিয়া হয় সারাদিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া শক্তি ক্ষয় কর, অথবা শুইয়া-শুইয়া অলস হইয়া পড়: এই কারণে তোমরা শারীরিক শক্তিতে কোন দিনই কুত্তার সাথে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। তারপর ধর আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের কথাটা: কুত্তা পলাইতে গেলে লেজ যায় তার আগে-আগে। আর তোমরা পলাইতে গেলে তোমাদের লেজটা দেড় হাত পিছনে থাকিয়া শত্রুকে তোমাদের পথের খবর দিয়া দেয়। সেজন্য পশুধম মানুষের হাতে তোমরাই বেশী মার খাও। তাছাড়া ধর, বর্তমান যুগটাই ইকনমিকসের যুগ। অল্প-পরিসরের জায়গায় বেশী জিনিস রাখিতে পারাই বিজ্ঞানের আবিষ্কার। কুত্তারা তাদের দুই হাত লম্বা লেজটা কি সুন্দররূপে ছয় ইঞ্চি জায়গার মধ্যে কোঁকড়াইয়া রাখে। অল্প সময়ের মধ্যে কুণ্ডলী পাকানো লেজের গুণাবলীর কথা তার কত বলিব?

শিবা।—তা হইলে হে পরম ভক্তিভাজন মাতুল ঠাকুর, আমরা এখন তবে কি করিব ?

রাজা।—তোমাদের ঝাড়ু মার্কা সোজা সরল লেজকে জিলাপির মত সুশ্রী সুন্দর কুণ্ডলীকৃত করিবার সাধনায় আজ হইতেই লাগিয়া যাও। আর যতদিন তা না হয় ততদিন স্বরাজ-স্বাধীনতা আন্দোলন ঠেকাইয়া রাখ।

শিবা।—তা ঠেকাইব নিশ্চয়। কিন্তু এই লেজকে অমন সুন্দররূপে কুণ্ডলীকৃত করিব কি উপায়ে ?

রাজা।—অতি সহজে। কুত্তার সদ্যজাত সাবকের চর্বি নিজ-নিজ লেজে মাখিবে এবং সূর্য্যোদয়ের প্রথম কিরণে চন্দন কাঠের ধূঁয়ার শেঁক দিবে।

শিবা।—আচ্ছা মাতুল মহারাজ তাই করিব। মহারাজাধিরাজের জয়।

পট পরিবর্ত্তন

সেই হইতে কুত্তারা লেজ সোজা করিবার এবং শিয়ালেরা লেজ কুণ্ডলী করিবার গোপন সাধনা করিতেছে। আন্দোলন বন্ধ আছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে নির্ধিবাদে রাজত্ব করিতেছে।

২০ শ্রাবণ, ১৩৪৯

পর্দা পাত